বিচিত্র বিজ্ঞান

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

বিচিত্র বিজ্ঞান

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

বিচিত্র বিজ্ঞান

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কল-৯

প্রকাশক :
শ্রীরবীন বল
শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা—৭০০০০৯

শিশুবর্ষে গৃহীত পরিকল্পনায়
প্রকাশিত ৮১ তম গ্রন্থ

প্রচ্ছদ : অক্ষয় গুপ্ত

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

নতুন মুদ্রণ 1989

মুদ্রাকর :
শ্রীশীতলচন্দ্র রায়
তারকেশ্বর প্রেস
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৬

ভূমিকা

অজানাকে জানার চিরন্তন আগ্রহ শুধু ছোটদেরই নয়—বয়স্ক পাঠকেরও।

মেঘ, বৃষ্টি, আবহাওয়া, বনভূমি, গাছপালা মহাকাশ অভিযান, গবেষণা ও কারিগরী বিদ্যার নানা বিষয় আজকের ছেলেমেয়েদের অবশ্যপাঠ্য বলে বিবেচিত হয়েছে, নিতান্ত পর্যবেক্ষনের বিষয় হিসেবেই।

প্রাকৃতিক পরিবেশ, আবহাওয়া, মহাকাশ, প্রযুক্তি ও কারিগরী বিদ্যার কৌতূহলকর নানা বিচিত্র প্রসঙ্গে সাময়িক পত্র পত্রিকায় বেশ কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। বেশীর ভাগ রচনারই প্রকাশকাল ১৯৬৭—১৯৬৮। সেই লেখাগুলির সংগে আরও কয়েকটি নতুন লেখা যুক্ত করেই 'বিচিত্র বিজ্ঞান' গ্রন্থের প্রকাশ। দ্রুত উন্নয়ণশীল বিজ্ঞানভাবনার যুগে কিছু কিছু তথ্যকে হয়তো আরও সমৃদ্ধ করা যেত। তা হলে হয়তো বর্তমান গ্রন্থের আকারই যেত বদলে। তাই সাময়িক চরিত্রের কথা ভেবেই তা আর করা হয়ে ওঠেনি। সীমিত সময়ের মধ্যে বের করার জন্য প্রকাশক, মুদ্রাকর ও শিল্পীদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়।

এই বইতে আছে ঃ

প্রাকৃতিক পরিবেশ

মহাকাশ

আবহাওয়া

কারিগরী ও প্রযুক্তি বিজ্ঞান



প্রাকৃতিক পরিবেশ

এক ঃ প্রাকৃতিক পরিবেশ

১. জলের আর এক নাম জীবন

'জলের মত সহজ সে তো অঙ্ক কষা নয়?' এই রকম একটা লাইন কে যেন কাকে বলেছিল। কোন কোন অঙ্ক নিশ্চয়ই জলের মত সহজ হতে পারে—যেমন ধর যে সব সরল কর প্রথমেই কাটাকুটি হয়ে এক কিংবা শূন্য হয়ে যায়। কিন্তু কথা হচ্ছে জল কি সব সময়েই সহজ? জমে বরফ হয়ে যাবার পর তো বলতে হবে জলের মত শক্ত। জল উবে স্টীম। তাহলে স্টীমের মত সহজ বললেই বা ক্ষতিটা কি। আসল কথাটা হল জল সম্বন্ধে আমাদের হেলাফেলা করে যা ইচ্ছে তাই বলা একটা স্বভাবে দাঁড়িয়েছে। কেন, পৃথিবীর দশ ভাগের সাত ভাগ জল বলেই বুঝি এত তাচ্ছিল্য? যে সব জায়গায় জল বলে কোন ব্যাপারই নেই—সেই সব গ্রহের বাসিন্দারা হলে তার একটু শ্রদ্ধা সহকারে জলের নাম উচ্চারণ করত।

জল কি গোড়া থেকেই ছিল? বাহী যত জাহাজ তলিয়ে গেছে

মহাসমুদ্রের অতলে তার মধ্যে এখন শ্যাওলা আর জলজ উদ্ভিদের বাসা। গভীর সমুদ্রের মাছ ঘুরে বেড়ায় সেখানে, তাদের গা থেকে বিচ্ছুরিত আলোয় স্বপ্নরাজ্য তৈরি হয়। কে না যেতে চায় সেখানে ? কিন্তু কি উপায়ে ? উপায় তো বেরোল কত রকম।

আবিষ্কারের বহু সূচনাই লুকোনো আছে মহাসমুদ্রের হাতছানির মধ্যে।

কত দুঃসাহসিক অভিযানের নিষ্ঠুর পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে এই বিপুল পরিমানে একত্রিত জল। হাজার মাইল অতিক্রম করে তা যখন উপকূলে আছড়ে পড়ে তখন প্রতি বর্গফুটের চাপ হয় কয়েক টন। সে চাপ সহ্য করে বেঁচে থাকবার জন্যে শামুক আর ঝিনুকের খোলা হতে হয়েছে গড়ানে আর শক্ত, তারা মাছের ছড়ানো হাতের তলায় অসংখ্য ফাঁপা নলের মত দাঁড়া থাকে আটকে রাখার জন্য। সমুদ্র উপকূলের যত উদ্ভিদ আর প্রাণী আছে তাদের টিকে থাকার জন্য প্রাণপণে আঁকড়ে থাকতে হয় কোন কিছুকে।

জলের মত সহজ বললেই জল খুব সহজ হয়ে গেল না। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আর্থার এডিংটন একবার বলেছিলেন 'তারা (নক্ষত্র) দের মত সহজ জিনিষ আর কিছু নেই—এদের আদ্যোপান্ত বুঝে ফেলা নেহাত সহজ।' ভাল যে বলেননি জলের মত সহজ। তা তো নিশ্চয়ই—মেঘনাদ সাহা তারা দেহের গঠন সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেছিলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের দশটি প্রধান আবিষ্কারের মধ্যে সেটি একটি বলে গণ্য হয়। কিন্তু তারাদেহকে বুঝে ফেলার পর সেদিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া তার সম্বন্ধে আমাদের আর কি-ই বা করার থাকতে পারে ? অবশ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানী একথা শুনে আপত্তি করবেন আমরা কাগজটা খুলে প্রথমেই রাশিচক্রে চোখ বোলাই তবে সবাই তো আর জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে আগ্রহী নই। কিন্তু আমরা চাই বা না চাই জলের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক জন্মের বহু আগে থেকে নির্দিষ্ট হয়ে আছে। জলের গঠন, রাসায়নিক উপাদান কি জেনে ফেলার পরেও এর রহস্যের শেষ হয়ে যায় না। এর তলায় লুকোনো আছে কত রত্ন ভাণ্ডার, ধনসম্পদ।

মহাসাগরের থেকেই প্রাণের উদ্ভব অথবা এর মধ্যেই নিহিত আছে মানব সভ্যতার ভবিষ্যত—এই জাতীয় কথাবার্তা অনেক সময় বলা হয় বটে। অতীত এবং ভবিষ্যত তো বটেই—বর্তমান পরিস্থিতিতে মানুষের সঙ্গে মহাসিন্ধুর সম্পর্কটা কি—এগুলো সবই খুব জটিল বিষয়। সমস্ত প্রাচীন সভ্যতাই গড়ে উঠেছে নদীকে কেন্দ্র করে—এটা বললেই সব বলা হয়ে গেল না। সেই আদিকাল থেকে সমুদ্রের উপর ভেসে পড়তে অস্থির হয়েছে দুঃসাহসী মানুষ।

২. নদী যখন নাব্য নয়

হুগলী নদীতে জাহাজ চলাচলে থেকে থেকেই বিঘ্ন ঘটছে কিন্তু ১৯৫৪ সালের আগে পর্যন্ত বিশেষজ্ঞরা মনে করতেন জোয়ার ভাঁটা থাকলেই এই অসুবিধা ঘটবে। এই অসুবিধা দূর করার জন্য যে কিছুই করা হয়ে ওঠেনি তার প্রধান কারণ খোদার উপর খোদকারী করতে গেলে পাললিক নদী যে কি আকার ধারণ করবে সে সম্বন্ধে কিছুই জানা ছিলনা। অবশ্য মূল প্রবাহ থেকে আসা জলের অপ্রতুলতা নিয়েও কারো মধ্যে মতদ্বৈধ ছিলনা। এখন উপায়? ড্রেজিং করা হচ্ছে ১৯১৭ সাল থেকে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, যতই পলি খুঁড়ে তুলে ফেলা হোক—নদী ক্রমশঃ অগভীর হয়ে আসছে। ড্রেজিং দিয়ে এই প্রক্রিয়া বন্ধ করা যাচ্ছে না।

স্বাধীনতার পর নদীবিজ্ঞান নিয়ে তৎপরতা বাড়ল। পুণার কেন্দ্রীয় জল ও শক্তি গবেষণা কেন্দ্রে মডেল তৈরী করে পরীক্ষা হতে লাগল। সেই পরীক্ষার ফল অনুযায়ী পূর্বঘাট অঞ্চলে সাফল্যের সঙ্গে নদী নিয়ন্ত্রণের কাজও হল। কিন্তু হুগলী নদীতে ঠিক কি পদ্ধতি কার্যকর হবে তা জানতে গেলে আরো সমীক্ষা চাই। শুদ্ধমাত্র নদী ও জোয়ার সংক্রান্ত সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য ১৮৬২-তে তৈরী হল একটি স্বতন্ত্র বিভাগ—কলকাতা পোর্ট কমিশনারের হাইড্রলিক স্টাডি ডিপার্টমেন্ট। ভাগীরথী নদীর স্বভাব-চরিত্র হল এঁদের গবেষণার বিষয়। ভাগীরথী থেকে যে পলি এসে হুগলীতে জমা হচ্ছে সেটা কোথা থেকে, কিভাবে, কতদিনে আসছে তার আদ্যোপান্ত সমীক্ষা করে দেখার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন এঁরা। নদী গর্ভে কি কি শক্তি

সক্রিয়, জলপ্রবাহের গতি ও দিক পরিমাপ, বিভিন্ন স্টেশনে পলির নমুনা পরীক্ষা করে তেজস্ক্রিয়তার সাহায্যে তার গতিপথ অনুসরণ ইত্যাদি বিষয়ে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাজ চালান হল। জল চলবিদ্যা বা হাইড্রলিকস আজকাল শুধু যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে তাই নয় এই বিজ্ঞানের অবস্থা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশী উন্নত। অনুরূপ সমস্যা ইউরোপের নানা নদীতেও আছে, কিন্তু কিছুদিন আগে পর্যন্ত কোনরকম সিদ্ধান্ত পৌঁছতে জল-বিজ্ঞানীদের দশ থেকে কুড়ি বছর লেগে যেত। আজকাল ডিজিটাল কমপিউটারের সাহায্য নিয়ে কাজ অনেক দ্রুত হয়েছে। যাই হোক্ বহু অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহের পর হাইড্রলিক স্টাডি ডিপার্টমেন্ট ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি পরিকল্পনা দাখিল করলেন

৩. ফরাক্কার পরে

তাঁরা দেখালেন যে হুগলীর নাব্যতা বজায় রাখতে গেলে কতকগুলি কাজে অবিলম্বে হাত দিতে হবে। এর মধ্যে সর্বপ্রধান হল মূল নদী থেকে জলের প্রবাহ অব্যাহত রাখা এবং সেই সঙ্গে অতিরিক্ত পলি আসা নিবারণ। এর পরে হুগলীর স্বার্থরক্ষার খাতিরে করতে হবে ভাগীরথীর উন্নতিবিধান। এর পরেও নিম্ন হুগলীতে কিছু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রাখা অত্যাবশ্যক, কেননা হুগলীর স্বভাব কেবল দুকূল ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়া, যার ফলে নদীগর্ভ হয়ে পড়ে অগভীর। এই সবগুলি অত্যাবশ্যক ব্যবস্থা যখন সম্পূর্ণ হবে তখন কলকাতা বন্দরে সারা বছরই ২৬ ফুট গভীর জাহাজ আসা যাওয়া করতে পারবে, ২৮ ফুট গভীর জাহাজ আসতে পারবে বছরে ২০০ দিন এবং ২৯ ফুটের জাহাজ আসবে বছরে ১০০ দিন। তখন ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত ড্রেজিং করে পলিমাটি তুলে ফেলার ঝামেলা অনেকটা কমবে, আর যে বানের দাপটে বন্দরে নোঙর-বাঁধা জাহাজগুলির অবস্থা শোচনীয় সেই বান প্রায় হবে না বললেই চলে। এই প্ল্যান যখন প্রথম দাখিল করা হয় তখন এসব অনেকটা আকাশ কুসুম বলেই

মনে হয়েছিল। ১৯৬৪ সালেই হাইড্রলিক স্টাডি বিভাগ বলেছিলেন, হুগলীর নাব্যতা কমে আসছে বলে হাল ছেড়ে দেবার কিছু নেই। এই নদীর স্বভাব পর্যবেক্ষণ করে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার ক্ষমতা এর যথেষ্টই আছে। সুতরাং এই সব ব্যবস্থা অবলম্বন করে নদীর উন্নতি করা যেতে পারে যার ফলে হলদিয়াতে সারা বছরই ৩৮ ফুট গভীর জাহাজ আসা যাওয়া করবে এবং কলকাতাতে ২৬ ফুট। এখন মনে হচ্ছে এ স্বপ্ন নেহাতই আকাশ কুসুম নয়। ফরাক্কা সম্পূর্ণ হলে মূল নদী থেকে জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হবে, তখন নিম্ন হুগলীতে পরিকল্পিত ব্যবস্থা কাজে পরিণত করা অসম্ভব হবে না।

হাইড্রলিক স্টাডি ডিপার্টমেণ্ট-এর কর্মক্ষেত্র কেবল ভাগীরথীতেই সীমাবদ্ধ নয় এঁরা নিম্ন হুগলী এবং নদীর মোহনাতেও তথ্য খুঁজে বেড়াচ্ছেন। 'অনুসন্ধানী' নামে এঁদের একটি জাহাজ আছে। সেটি একটি ভাসমান ল্যাবরেটরী। এই জাহাজে প্রধানত মোহনা অঞ্চলে এবং বঙ্গোপসাগরে নানাবিধ পরিমাপ নেওয়ার কাজ চলে। জাহাজটি এমন ভাবে তৈরী যাতে প্রতিকূল আবহাওয়াতেও একে স্বচ্ছন্দে চালান যেতে পারে। এদের মতে হুগলীর মোহনা নদী-গবেষকের কাছে নানা বিধ চ্যালেঞ্জ পূর্ণ। এই অঞ্চল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তথ্য যোগাড় করতে পারলে তার দ্বারা নদীবিজ্ঞান, বাণিজ্য এবং বিশেষভাবে বন্দরের যে খুবই উপকার হবে তাতে সন্দেহ নেই।

৪. হুগলী বিচিত্র নদী

গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্র তাদের মিলিত উপনদীগুলি নিয়ে যে অন্তর্দেশীয় জলপথের সৃষ্টি করেছে তার দৈর্ঘ্য চারহাজার মাইল। বিরাটত্বের দিক দিয়ে এই দুই নদীর অববাহিকা বৈশিষ্ট্যের দাবী নিশ্চয়ই করতে পারে। নদী বিজ্ঞানীরা অবশ্য অন্য কারণে এদের প্রতি আকৃষ্ট। জলের বাড়াকমা, গতিপথের পরিবর্তন ইত্যাদি খামখেয়ালের জন্য বিখ্যাত নদী দুটি ভৌগোলিক ঐতিহাসিক উভয়

দলকেই জোগাচ্ছে গবেষণার উপকরণ। বিশেষত পথ বদলের ব্যাপারে গঙ্গার তো কোনো তুলনা নেই। ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপর এর প্রভাব প্রত্যক্ষ। কত নগরীর উত্থানপতন জড়িয়ে আছে গঙ্গা তার উপনদীগুলির প্রবাহের সঙ্গে। ঘর্ঘরার তীরে অযোধ্যা, ভাগীরথীর তীরে গৌড়, গঙ্গার তীরে হস্তিনাপুর, পাটলিপুত্র যে সব কারণে সমৃদ্ধির শীর্ষ থেকে ক্রমে অবলুপ্তির পথে চলে গেছে নদীর খামখেয়াল তার অন্যতম প্রধান কারণ বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। অন্তত নদী বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাচীন ইতিবৃত্ত থেকে যে কত তথ্য পাওয়া গেছে তা বলে শেষ করা যাবে না। প্রাচীন কালের চীনা পরিব্রাজকদের বৃত্তান্ত থেকে আরম্ভ করে মোগল যুগের আইন-ই-আকবরি, পরে কবিকঙ্কন চণ্ডী ইত্যাদি থেকে জানা যায় গঙ্গার প্রধান প্রবাহ কবে কবে কোন দিক দিয়ে গেছে। নদীবিজ্ঞানীরা এইভাবে জেনেছেন পনেরো শতাব্দী পর্যন্ত গঙ্গার প্রধান প্রবাহ ছিল ভাগীরথী, যা আরো দক্ষিণে নেমে হুগলী নাম নিয়েছে। পর্তুগীজরা হুগলী—ভাগীরথীর উপর হুগলী বন্দর স্থাপন করে। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীতেই গঙ্গার মূল প্রবাহ ভাগীরথী ছেড়ে পদ্মায় চলে গিয়েছিল। হুগলী নদীর অবনতি হতে হতে এখন এমন অবস্থা যে বছরে মাত্র তিন মাস ভাগীরথী, ভৈরব জলঙ্গী আর মাথা ভাঙ্গা-চুর্নী থেকে উপচে পড়া জল হুগলীতে এসে পড়ে। অন্য সময় হুগলীর জল জোয়ারের টানে সমুদ্র থেকে আসে। গত শতাব্দীতেই বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার সার আর্থার কটন প্রস্তাব করেছিলেন রাজমহলে গঙ্গার উপর একটি ব্রীজ তৈরী করার। তখনো পর্যন্ত হুগলী-ভাগীরথীর সমস্যা ছিল আভ্যন্তরীন জলপথের ব্যাপার !

৫. বন্দরের কাল হল শেষ

যে নদীতে বছরে মাত্র তিনমাস মূলপ্রবাহ থেকে জল আসে তার ভবিষ্যত কি? ইতিহাসে নজীরের অভাব নেই। গঙ্গারই এক শাখানদী সরস্বতীর তীরে সপ্তগ্রাম ছিল একসময় বাংলার সমৃদ্ধ বন্দর। কিন্তু সরস্বতী নদীর জলপ্রবাহের ক্রমশঃ অবনতির ফলে সরস্বতী আজ

হতগৌরব। যে কোন বন্দরের অস্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে পশ্চাদশভূমির ধনসম্পদ ও নদীর নাব্যতার উপর। কলকাতা বন্দর সমুদ্র থেকে একশো কুড়ি মাইল ভিতরে, এর পশ্চাদপ্রদেশ খনিজ সম্পদে পূর্ণ এবং একযোগে যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের চেয়ে আয়তনে বড়। কিন্তু বিচিত্র পরিস্থিতিতে এখন হুগলীর মধ্যে নাব্য গভীর জলপথ মাত্র ২৫০ থেকে ৩৫০ ফিট চওড়া। বানের সময় ভারী মালবাহী জাহাজগুলিকে জেটি ছেড়ে ডকে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়। এমন কি একসময় অপেক্ষাকৃত হালকা জাহাজগুলিও সরিয়ে জেটি একেবারে উন্মুক্ত রাখতে হয়। চার থেকে ছ-ফিট উঁচু জলের দেওয়াল যখন এসে প্রবলবেগে আছড়ে পড়ে তখন তার দাপটে নোঙর ছিঁড়ে জাহাজ ভেসে যাওয়া বা ডুবে যাওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। প্রতিবার জোয়ারের সঙ্গে যে বালি পড়ে নদীগর্ভ ক্রমে অগভীর করে তুলছে কেবল ড্রেজিং করে তার সমাধান হওয়া সম্ভব নয়। একমাত্র উপায় প্রবল নদীপ্রবাহে সেগুলি ধুয়ে যাওয়া। কিন্তু মৃতপ্রায় হুগলীতে জলের প্রবাহ কই? তবে কি ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি এখানেও ঘটতে চলেছে? শিল্প বিপ্লবের পর থেকে ক্রমবর্ধমান কলকাতা বন্দর, সেখানে ১৮২৫ সালের পাঁচশো টনের ধীরগতি জাহাজ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক যুগে এসেছে তিরিশ হাজার টনের জাহাজ, যে বন্দর দিয়ে দেশের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ রপ্তানি মাল বাইরে চালান যাচ্ছে, পৃথিবীর দশটি বৃহত্তম নগরের একটি সেই কলিকাতা কি বুজে আসা হুগলীর তীরে অসহায়ভাবে ক্রমশ মৃত্যুর প্রতীক্ষা করবে? হুগলীর মতিগতি দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে ১৮৫৩ সাল থেকেই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ চাওয়া হচ্ছে, ডাকা হয়েছে বিশ্ববিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার ও বিজ্ঞানীদের। অবশ্য নদী বিজ্ঞান তখনো ততটা অগ্রসর নয়, চলজল বিদ্যা বা হাইড্রলিকস-এর অনুশীলন আরম্ভই হয়নি। অনেক বিশেষজ্ঞের ধারণা ছিল নদীর অবনতির একমাত্র কারণ গতিপথের পরিবর্তন। ১৯৫৭ সাল নাগাদ একেবারে নিশ্চিতভাবে জানা গেল হুগলীর অবনতি কি ভাবে হচ্ছে। তখন তাকে যে কোন প্রকারে আটকানো ছাড়া আর অন্য কোন পথ রইল না।

৬. ভারত মহাসাগরের পার্বত্য অঞ্চল

রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটি হয়ত তোমরা পড়ে থাকবে যাতে বলা হয়েছে আমরা কষ্ট করে বহুদূর দেশে প্রাকৃতিক শোভা দেখতে যাই অথচ বাড়ীর পাশে একটি ধানের শীষের উপরে এক ফোঁটা শিশির পড়ে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় সেদিকে দেখেও দেখিনা। এখন চাঁদের পাহাড় থেকে টুকরো এনে বৈজ্ঞানিকেরা মাথা ঘামাতে বসেছেন চাঁদের গঠন নিয়ে, অথচ আমাদের ঘরের কাছে ভারত মহাসাগর, তার সমুদ্রতলের কত জিনিস এখনো অজানাই রয়ে গেছে।

পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল এই মহাসাগরকে ঘিরে। কিন্তু কৌতুহল কি ভারত মহাসাগরকে ঘিরে সবচেয়ে বেশী? নানা কারণ ছিল, যে জন্য প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর সম্বন্ধে অনুসন্ধান আর পরীক্ষা অনেক বেশী হয়েছে। কিছু দিন যাবৎ দেখা যাচ্ছে অনেক আন্তর্জাতিক ও ভারতীয় সংস্থা বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ শুরু করেছেন এই অঞ্চলে। 'অনুসন্ধানী' নামে গবেষণা জাহাজটি গঙ্গার মোহানা থেকে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে কিছুদিন কাজ করেছিল, তোমরা হয়ত তার কথা শুনে থাকবে। সব থেকে প্রথম শোনা যায় ১৮৭২-৭৬ খৃষ্টাব্দে ভারত মহাসাগরে বৈজ্ঞানিক তথ্য সন্ধানে অভিযানের কথা—'চ্যালেঞ্জার' ছিল এই জাহাজটির নাম। তারপরেও ১৮৮৯, ১৯০৬, ১৯২২, ও ১৯৪৭ সালেও উল্লেখযোগ্য অভিযান হয়েছে। যুদ্ধের সময় ভারত মহাসাগরের ততটা সামরিক গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু ১৯৫৭ সালের পর থেকে পরিকল্পিত ভাবে ভারত মহাসাগরকে ছকে ফেলার অভিযান আরম্ভ হয়।

এই কার্যসূচীর নাম আই, আই, ও, ই, অর্থ্যাৎ ইন্টারন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান ওশান একস্‌পিডিশন্—আন্তর্জাতিক ভারত মহাসাগর অভিযান। তেরোটি দেশের একচল্লিশটি জাহাজ এ পর্যন্ত এই অভিযানে যোগ দিয়েছে, তারমধ্যে আছে রাশিয়া, আমেরিকা, গ্রেটব্রিটেন, জাপান,অস্ট্রেলিয়া, পশ্চিম জার্মানি এবং ভারত যে আছে তাতো বলাই বাহুল্য। এইসব অভিযানগুলি একসঙ্গে পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, সমুদ্রতলবিদ্যা, ভূতাত্বিক মিটিওরালজি এবং অন্য অনেক শাখার বিজ্ঞানীদের বহু দরকারী খবর দিয়েছে।

১৯৬০ সালে তৈরী হল আই, এন, সি, ও, আর, অর্থ্যাৎ ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কমিটি অন ওশানিক রিসার্চ। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল সমুদ্রতলের নানা দিক নিয়ে যাঁরা পর্যবেক্ষণ চালাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন। জিওলজিকাল সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়া থেকে প্রথম এদিকে কিছু কাজ হয়। এঁরা ভারতের তটরেখা, সমুদ্রতলের আগ্নেয়গিরি এবং তলদেশের গঠন নিয়ে গবেষণা করেছেন। ক্রমেই এখন বৈজ্ঞানিকরা দেখছেন ভূতত্ববিদ্যা মানে জিওলজিকে সমুদ্রতলে পাওয়া উপাদানের উপর অনেক বেশী পরিমাণে নির্ভরশীল হতে হবে। হয়ত এর ফলে জিওলজি-বিজ্ঞানটির মধ্যেই এক বিরাট পরিবর্তন আসবে। কেননা এতদিন জিওলজি ছিল জলের উপরে দৃশ্যমান জগতের মাটি পাথর নিয়ে চিন্তিত। জলের তলায় যে অনাবিষ্কৃত ভূত্বকের খবর পাওয়া যাচ্ছে তার গুরুত্ব এত বেশী যে 'মেরিন জিওলজি' বলে একটি আলাদা শাখাই এখন গড়ে উঠেছে। নতুন ও অজানা বিষয়ে জানতে পারার কথা বাদ দিলেও মেরিন জিওলজি থেকে প্রত্যক্ষ উপকার বড় কম নয়। যেমন ধরা যাক নদীর মোহানায় ও কন্টিনেন্টাল শেল্‌ফে পলিমাটি জমা হওয়ার খবর।

অগভীর উপকূল অঞ্চলে নদীর সঙ্গে যে পলিমাটি এসে সমুদ্রতলে জমছে তার জমা হওয়ার ধরণ নির্ভর করে ঢেউ, স্রোত, জোয়ার-ভাঁটা এবং ধাতু পরিবর্তনের উপরে। এই পলিমাটি জমা হওয়ার উপর নির্ভর করছে তটরেখার ক্ষয়, তাছাড়া বন্দরের নাব্যতা ইত্যাদি। হুগলী ও পারাদ্বীপে পলিমাটি জমা হওয়া ও কেরালা উপকূলের

ক্ষয়প্রাপ্তি এগুলি নিয়ে মেরিন জিওলজিস্টরা এখন সক্রিয়ভাবে ভাবিত। কেননা অন্য অনেক দেশে পলিমাটির কুফল এড়াবার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেরকম এখানেও করা সম্ভব।

মেরিন জিওলজি বিদ্যা এতদিন যে ততটা উন্নতিলাভ করতে পারেনি তার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। প্রথমত মাপজোকের যন্ত্রপাতির ঘাড়ে করে বেরিয়ে গেলেই তো হলনা, সমুদ্রের তলায় নামতে গেলে আরো অনেক ব্যাপার আছে। সমুদ্রের তলায় তেল বা অন্য খনিজের খোঁজ অনেক সময় করা হয়েছে বটে কিন্তু জলের তলাকার চাপের জন্য খুব গভীরে ডুবুরীদের নামা প্রায় অসম্ভব। এর জন্য গভীর সমুদ্রে যাবার উপযুক্ত জাহাজও যে চাই তা তো বলাই বাহুল্য। জিওলজিকাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া সেইজন্য ১৯৬৪ সালে আই, এন, এস, কৃষ্ণাতে গিয়েছিলেন সমুদ্রতল থেকে নমুনা কুড়োতে। জাহাজটি ছিল আই, আই, ও, ই, সংস্থার। ডাইভিং করা কেবলমাত্র উপকূলের অগভীর অ-চলেই হতে পারে যেখানে পেট্রোলিয়াম থাকার বেশী সম্ভাবনা। এছাড়া একরকম যন্ত্র আছে যার নাম 'গ্র্যাব্ স্ন্যাপার্', তার মুখটা অনেকটা একটা হাঁ করা জন্তুর মতন। নীচে পৌঁছেই এই মুখ মাটি কামড়ে অনেকটা নমুনা নিয়ে বন্ধ হয়ে যায়। এর সঙ্গে ক্যামেরাও লাগানো থাকে। যদি মাঠি খুঁড়ে অনেক গভীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করতে হয় তাহলে ব্যবহার করা হয় পিস্টন গ্র্যাভিটি কোরার। এইজাতীয় অনেক যন্ত্র জিওলজিকাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়াতে তৈরী করা হয়।

সমুদ্রের তলায় সবটাই যে সমতল নয় সেকথা কে না জানে। যেহেতু ম্যাপে জলের সবটাই নীল, কোথাও বা হাল্কা, তাই আমরা ভুল করে মনে করতে পারি পৃথিবীর স্থলভাগেই যত পর্বত, উপত্যকা, গুহা ইত্যাদির বৈচিত্র, আর জলভাগ (যা পৃথিবীর বেশীটা জুড়ে আছে), নেহাতই একঘেঁয়ে। কিন্তু মহাসাগরের অতল জলেরও তল

আছে, সেখানে আছে, পাহাড় পর্বতমালা, উপত্যকা, বেসিন, আগ্নেয়গিরি, সমতল ইত্যাদি। ভারত মহাসাগরের ম্যাপের দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে গঙ্গার মোহানার থেকে কন্টিনেন্টাল স্লোপ খুব ধীরে ধীরে এক ডিগ্রী, দু ডিগ্রী, শেষে চার থেকে ছ ডিগ্রী করে নেমেছে। সিংহলের কাছে এই ঢাল প্রায় দশ ডিগ্রী। পশ্চিম উপকূলে আরবসাগরের কন্টিনেন্টাল লোপ অনেক বেশী খাড়া। এই স্লোপ ক্রমে নামতে নামতে পৌঁছচ্ছে আরেবিয়ান বেসিনে। তারপর উত্তর-দক্ষিণে খাড়া মালদ্বীপ রিজ ও কার্লস্‌বার্গ রিজ, এগুলি ক্রমশঃ দক্ষিণে গিয়ে মিলেছে মিড্-ইণ্ডিয়ান রিজের সঙ্গে। বঙ্গোপসাগরে আছে আন্দামান-নিকোবর রিজ—তার এক শাখা চলে গেছে পূবে সুমাত্রা খাড়ি (বা সুমাত্রা ট্রেঞ্চ)। বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণে আছে ইণ্ডিয়া-অস্ট্রেলিয়া বেসিন্, আন্দামান-নিকোবর রিজের পূবে হল আন্দামান বেসিন্।

মিড্-ইণ্ডিয়ান্ ওশান রিজ হল একটি ৪০০০ কিলোমিটার লম্বা পর্বতমালা।

৭. মেঘ ও বৃষ্টি

আবহাওয়া নিয়ে লোকে কথা বলে কখন? আলোচ্য বিষয়ের অভাব ঘটলে কিংবা অল্প পরিচিত লোকের সঙ্গে আলাপ করতে হলে এই বিষয়টা এমনই যা নিয়ে কোনমতেই তর্ক চলতে পারেনা, অতএব মাথা ঠাণ্ডা রেখে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায় হল এই। সাধারন আবহাওয়া নিয়ে মেজাজ গরম করাটা রেওয়াজ না হলেও যখন আবহাওয়া এমনিতেই উত্তপ্ত তখন অবস্থাটি কি দাঁড়ায় আমরা তা মর্মে মর্মে জানি। গ্রীষ্মের প্রকোপে প্রত্যহ একাধিক লোকের মৃত্যু ঘটেছে, জলাশয় শুখিয়ে যাচ্ছে, রাজনৈতিক নেতারা পর্যন্ত গরমের শিকার হচ্ছেন, এই ধরণের যে সব খবর আজকাল নিত্যকার ঘটনা সেগুলি নিশ্চয় উপেক্ষার বস্তু নয়।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস যাঁরা দেন তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য আমাদের ভুল পথে চালিত করা এই ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা ঠাট্টা তামাসা করি, অথচ আবহাওয়াবিদদের পক্ষে নির্ভুল ভবিষ্যৎবাণী করা যে কত কঠিন সে বিষয়ে আমরা মোটেই ভেবে দেখিনা। কোথায় কে যেন বলেছিলেন কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যাবে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়ার চেয়ে আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করা অনেক সহজ হয়ে গেছে। আপাততঃ কোথাও কোথাও আংশিকভাবে স্থানীয় আবহাওয়াকে বশ মানানো গেলেও ব্যাপকভাবে আবহাওয়া মানুষের বশ্যতা স্বীকার করেনি। এই নিয়ে কিন্তু বহুদিন থেকেই চলছে। জানা যায় ১৮৮৭ সালে টর্নেডো ধ্বংস করার জন্য এক রকম বিস্ফোরণের পেটেন্ট দেওয়া হয়। অভিনব আবিষ্কারের মূলে ছিল বোধ হয় কামান ছুঁড়ে জলস্তম্ভ ভেঙ্গে দেওয়ার গল্পটি। গত শতাব্দীর শেষের দিকে বৃষ্টি তৈরী সম্বন্ধে দুটি পেটেন্ট নেওয়া হলেও আবহবিজ্ঞান তখনো পর্যন্ত নাবালক অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

৮. ইচ্ছামত বৃষ্টিপাত

১৯৪০ সালের পর থেকে বলা যায় আবহবিজ্ঞানে এক নতুন উদ্যমের সূচনা হয়েছে। অধিকতর তৎপরতার সঙ্গে গবেষণা আরম্ভ করলেন বিজ্ঞানীরা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্লেনের ডানায় বরফ জমে যাওয়া নিয়ে গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। যুদ্ধ থামবার পরেও সামরিক সমস্যা হিসাবে যে গবেষণা আরম্ভ হয়েছিল তার জের অব্যাহত রইল। উঁচু মেঘে জলকণা সম্বন্ধে পরীক্ষা করছিলেন ল্যাংমুর ও শেফার নামে দুই মার্কিন বিজ্ঞানী। তাঁরা দেখলেন গবেষণাগারে অতি শীতল আবহাওয়া সৃষ্টি করলেই জল জমে যায়, কারণ ঠাণ্ডা জলের পাত্রের সংস্পর্শে এসে জল প্রথমে বরফ হতে আরম্ভ করে। কিন্তু খোলা আকাশে অপর কোন বস্তুর সান্নিধ্য নেই বলে মেঘ অনেক সময় হিমাঙ্কের নীচে পৌঁছেও অবিকল থাকে। তাহলে যদি অতিশীতল মেঘে দু-একটি বরফের কেলাশ প্রবিষ্ট করিয়ে দেওয়া যায়? ল্যাংমুর ভেবে দেখলেন যে এভাবে কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টির সূচনা করা যেতে পারে।

বৃষ্টির রহস্য বোঝা গেল। এবার শেফার ও তাঁর এক বন্ধু একটি ছোট প্লেন নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন অতিশীতল মেঘের খোঁজে। কিছুদূর গিয়ে একটি হাল্কা মেঘের দেখা পাওয়া গেল। মেঘটি মাইল চারেক লম্বা। শেফার এর মধ্যে নিক্ষেপ করলেন জমানো কার্বন ডায়ক্সাইডের গুঁড়ো। সঙ্গে সঙ্গে একটি নাটকীয় ব্যাপার ঘটল। মেঘটি প্রথমে কুঁচকে, ফুলে ঠিক ঝোড়ো মেঘের আকার ধারণ করল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে মেঘের বদলে ভেসে রইল একটি তুষারের মালা। তারপর এই মালা ভাসতে ভাসতে মিলিয়ে গেল।

৯. মাটি থেকে বৃষ্টি

মেঘের মধ্যে কণাবপন করে বৃষ্টির আরো চেষ্টা পরে হয়েছে, তবে এই পদ্ধতি খরচ সাপেক্ষ। ভারতবর্ষেও এই নিয়ে উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা করা হয়েছে। মাটি থেকে কম খরচে বৃষ্টির সঞ্চার করা যেতে পারে কিনা সে চেষ্টাও অনেকে করেছেন। একবার পূর্ব আফ্রিকাতে একটি অভিনব পরীক্ষা হয়। বেলুনে বারুদ ও গুঁড়ো নুন ভরে মেঘের মধ্যে পাঠান হল। সেখানে বেলুনটি ফেটে চারিদিকে নুনের কেলাশ ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিম পাকিস্তানের জলবায়ু শুষ্ক, সেখানেও বৃষ্টি নিয়ে কিছু কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে। সেখানে রাস্তার উপরে পরীক্ষামূলকভাবে লবণের গুড়ো ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল যাতে পথচারীদের পায়ে পায়ে সেগুলি হাওয়ার সঙ্গে মেশে এই সব পরীক্ষা থেকে অবশ্য এখনো কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌছন সম্ভভ হয়নি।

আগে থেকে মেঘের জলভার লাঘব করে যদি শিলাবৃষ্টি নিবারণ করা যায় তবে সেটা কৃষকদের পক্ষে সমূহ লাভ। খবর পাওয়া গেছে দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্বদিকে লণ্ডলুক অন্তরীপে চাষারী শিলাবৃষ্টিতে গাছের আপেল নষ্ট হওয়ার ভয়ে রকেটে করে মেঘের মধ্যে সিলভার আয়োডাইড ছুঁড়ে থাকে। সিলভার অধঃক্ষেপণ দ্রুততর হয়, বড় শিলা জমে ওঠার সময় পায়না।

১০. মেঘের পরে মেঘ

আবহাওয়া অফিস আজকাল প্রায়ই সাবধান করে দিচ্ছেন, বিকেলের দিকে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। আকাশের মেঘ যে সব সময় হাওয়া অফিসের কথামত আসে যায় এমন নয়, তবে মোটামুটি কতকগুলো প্রাকৃতিক নিয়ম এরা মেনে চলার পক্ষপাতী। যেমন তাপের তারতম্যের ফলে বায়ু প্রবাহের সৃষ্টি হয়, নিস্তরঙ্গ সমুদ্রে সূর্যতাপে বাতাস গরম হয় এবং জলীয় বাষ্পে ঘনীভূত হয়। ঘনীভবনের ফলে হয় বৃষ্টি। আকাশে মেঘের ঘনঘটা দেখলে নানা জনের মনে নানা ভাবের উদয় হয়। হয়ত বৃষ্টি না হয়ে দমকা হাওয়ায় মূল মেঘের পুঞ্জ থেকে খানিকটা আলাদা হয়ে উড়ে গেল। ঐ রকম এক বিচ্ছিন্ন মেঘকেই বোধ হয় বিরহী যক্ষ দূত করে পাঠিয়েছিল তার প্রিয়তমার কাছে, সেই মেঘ কি শেষ অবধি গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পেরেছিল ; না পথিমধ্যেই চোখের জল হয়ে ঝরে পড়ে গেল ? অরসিক আওয়াবিদ বলবেন এরকম একটা সম্ভাবনা সব সময়ই আছে। তাঁর দৃষ্টিতে যদি দেখেন তবে মেঘদূত বন্ধ করে বলতে হয় আমাদের এই পৃথিবীর মাটি একটা বিরাট বিদ্যুৎ উৎপাদক কেন্দ্রের একটি ইলেকট্রোডের সঙ্গে তুলনীয়। মেঘের মধ্যে জমছে পজিটিভ চার্জ, নীচে পৃথিবীর পরিবাহী মাটিতে সঞ্চারিত হল নেগেটিভ চার্জ। মেঘ আরো নেমে এল। দুই বিপরীত চার্জের মধ্যেকার হাওয়া এতক্ষণ অন্তরকের কাজ করছিল কিন্তু দেখা গেল আর পেরে উঠছে না। চক্ষের নিমেষে একটা ঘটনা ঘটে গেল। হাওয়ার মধ্য দিয়ে পথ করে নেমে এল বিদ্যুৎ কণিকার স্রোত, যক্ষ চোখে দেখলেন সাদা আলোর ঝলক, আর বজ্রের গর্জন গুম গুম করে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল মেঘ থেকে মেঘে। আগে প্রাণ না আগে প্রিয়ার চিন্তা ? যক্ষ কি তখন খোলা মাঠে দাঁড়িয়েছিলেন না কোনো গাছের তলায় ? দুটি অবস্থাই সমান বিপদজনক।

১১. নয়ন ভুলুক বিজুলী ঝলুক

আকাশের বুকে যে বিদ্যুৎচমক দেখা যায় তার স্থায়ীত্ব এক সেকেণ্ডের লক্ষ ভাগের এক ভাগ। খালি চোখে মনে হয় বিদ্যুতের স্ফুরণ একবারই হয় কিন্তু চোখের দেখাটাই সব নয়। দ্রুতগতি ফটোগ্রাফির সাহায্যে বিদ্যুতের আসল রূপ বোঝা অনেকটা সহজ বোঝা অনেকটা সহজ হয়েছে। বিদ্যুতের গতি আঁকাবাঁকা এটা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু তার কারণ কি? আসলে বিদ্যুৎ স্ফুরণ মোটেই আকস্মিক ঘটনা নয়। এর গমন পথ আগে থেকে ঠিক করা থাকে। মেঘের চার্জ সন্ধিক্ষণে পৌঁছলে তার মধ্যে থেকে বিদ্যুৎ মাটির দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। বাতাস কেটে যাবার সময় এর গমন পথ হয়ে ওঠে তড়িৎ পরিবাহী। প্রতি একশো ফিটে পৌঁছে বিদ্যুৎ প্রবাহ থমকে যায়, এবং একটু ইতস্তত করার পর নতুন বিক্রমে আবার অন্যপথে অগ্রসর হয়। এই জন্যই বিদ্যুতের গতি আঁকাবাঁকা। এই থেমে থাকা অবশ্য অতি অল্প সময়ের জন্য, এক সেকেণ্ডের কয়েক লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র।

বিদ্যুৎ স্ফুরণ যে কেবল মাটি আর মেঘের মধ্যেই ঘটে তা নয়। একই মেঘের বিভিন্ন অংশে বা দুটি মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ মোক্ষণ হয়ে থাকে। মেঘ থেকে মেঘে বিদ্যুতের লাফ দশ থেকে কুড়ি মাইল অবধি হওয়াও বিস্ময়কর নয়।

বিদ্যুতের স্বভাব চরিত্র খানিকটা জানা থাকলে সময় বিশেষে আমাদের প্রাণরক্ষা হতে পারে। বজ্রাহত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা এমন কিছু অবহেলার বস্তু নয়। সাবধান হলে হয়ত অকালমৃত্যুর হাত থেকে কিছু লোক রক্ষা পেতেন। বিদ্যুৎ স্ফুরণের শেষে উঁচু জায়গা থেকে বিদ্যুৎ তরঙ্গ উৎপন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং ঝড়বৃষ্টির সময় উঁচু জায়গা থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়। পাহাড়ের উপর গাছ সবচেয়ে বিপদজনক স্থান। তবে সমতল ভূমিতে একটি মাত্র গাছও বজ্রপাতের সম্ভাব্য জায়গা। ঝড়ের সময় কোন গাছই নিরাপদ নয়। ঝড়বৃষ্টির সময় খোলা মাঠ থেকে দূরে থাকাই সঙ্গত। নীচু জমি বা গর্ত ঝড়ের

সময় নিরাপদ। অনেকের ধারণা জামাকাপড় ভিজে থাকলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হবার ভয় বেশী সোজাসুজি বজ্রপাত হলে অবশ্য অন্য কথা, কিন্তু ভাগ্য ভাল থাকলে কিছু বিদ্যুৎ প্রবাহ শরীরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত না হয়ে জামা-কাপড়ের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়।

১২. জর্নাহতে অ্যাটমবোমা ?

কোন টিয়া ওড়ে না ? বৃষ্টি কখন বিদ্বান হয় ? বোমা কখন উপকারী ? সবগুলিই কঠিন প্রশ্ন। উত্তর প্রবন্ধের শেষে দেওয়া আছে। এখনই পাতা উল্টে দেখার দরকার নেই, তার চেয়ে কিছুক্ষণ ভাবতে চেষ্টা করা যাক।

প্রথমেই দেখা যাক পরমাণু বোমা ক'রকম। মানহানি মোকদ্দমায় যেমন কুমীর প্রথমেই প্রশ্ন তুলেছিল কচু কয় প্রকার ? অ্যাটম বোমা, যাকে বাংলায় বলি পরমাণু বোমা, যা হিরোশিমা নাগাসাকিতে ফেলা হয়েছিল তা হল বিভাজন প্রক্রিয়ায় সংঘটিত বিস্ফোরণ আর হাইড্রোজেন বোমা যা নাকি আরো বহুগুণে শক্তিশালী তা হল সংযোজন প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত।

বিভাজন কি ? পদার্থের সর্বশেষ বা আদি অবস্থা পরমাণু—পরমাণু সমবায়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তৈরি। এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরমাণুর ভিতরে আছে একটি নিউক্লিয়াস ও তাকে ঘিরে ছুটন্ত ইলেকট্রনের ঝাঁক।

অ্যাটম শব্দের অর্থই হল যাকে আর ভাঙা যায় না। পুরাকালে গ্রীকরা এই কথাই বলে গেছেন যখন তখন বোধহয় আস্ত অ্যাটম নিয়েই চিরকাল সন্তুষ্ট থাকতে হবে—এই রকম ভাবাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু বিধাতা ভাবেন এক মানুষ করে এক। তা না হলে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ইংলণ্ডের 'নেচার' বলে এক বিজ্ঞান পত্রিকায় একটি ছোট করে ছাপা খবর বেরোবে কেন ? খবরটা পাঠিয়েছিলেন ফ্রিশ ও মাইটনার নামে দুই জার্মান বৈজ্ঞানিক। পত্রিকার এক কোনে নেহাত সাদামাটা ভাবে ছাপা হয় সেই খবর।

এতে তাঁরা জানিয়েছিলেন হ্যান ও স্ট্রাসম্যান জার্মানীতে এক নতুন ধরনের শক্তির সন্ধান পেয়েছেন। ইউরেনিয়ম নিউক্লিয়াসে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলে সেটি প্রায় সমান দুভাগে ভাগ হয়ে যায় ও দুশো মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি সম্পন্ন হয়ে ওঠে ও তার সঙ্গে দু-তিনটি নিউট্রনও বেরোয়। কোথা থেকে এই শক্তির আবির্ভাব?

আইনষ্টাইন আগেই বলেছিলেন বস্তুর শক্তিতে রূপান্তরের কথা, বিভাজনের ক্ষেত্রে দেখা গেল তাঁর অনুমান একেবারে ঠিক। বিভাজনের ফলে নিউক্লিয়াস ভেঙে যে দুটি টুকরো হল সেই টুকরো দুটির ওজনের যোগফল নিউক্লিয়াসের ওজন থেকে কিছু কম। অর্থাৎ বিভাজনের ফলে খানিকটা বস্তু অবলুপ্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করল শক্তিতে।

বস্তুর অবলুপ্ত হওয়া বড় সাংঘাতিক ব্যাপার। কয়লা বা কাঠ বা গ্যাস পোড়ালে তা অবলুপ্ত হয় না, অন্য রাসায়নিকে পরিবর্তিত হয়, এই মাত্র। বিভাজনের ফলেও অবশ্য বস্তু একেবারে চিরতরে বিলীন হচ্ছে না, হারিয়ে যাওয়া বস্তু চেহারা বদলে পরিণত হচ্ছে শক্তিতে। পৃথিবীতে হারায় না কিছুই। রবীন্দ্রনাথ তো অনেকদিন আগেই বলেছেন "হারায় না কভু অণুপরমাণু।" হারালে আর পরমাণু বোমা হত কি দিয়ে? বিভাজনের ফলে যে বোমার সন্ধান দেখা দিল তার কারণ অতি সরল। একগ্রাম ইউরেনিয়মে আছে $১০^{২৩}$টি নিউক্লিয়াস। এবং বিভাজনের ফলে একটি পরমাণুর কেন্দ্রে বিভাজন ঘটিয়ে বার হচ্ছে দুশো ইলেকট্রন ভোল্ট। এর তাৎপর্য্য কি বুঝতে শুধু বৈজ্ঞানিক কেন রাজনীতিবিদরাও পারেন।

এই আবিষ্কারের পর থেকে পরমাণু শক্তি, পরমাণু বোমা কি করে হল তা এখন ইতিহাস হলেও গল্পের মতই চমকপ্রদ। কিন্তু সে কথা থাক।

অন্য বোমার কথা হচ্ছিল। হাইড্রোজেন বোমা যা সংযোজন প্রক্রিয়ায় বানানো হয়। বিভাজনের মূল তত্ত্ব যেমন বস্তু ভেঙে তার খানিকটার শক্তিতে রূপান্তর, সংযোজনে তার বদলে হচ্ছে—বস্তু জুড়ে তার খানিকটা অবলুপ্ত হয়ে শক্তিতে রূপান্তর। সূর্যদেহের মত

তাপে যদি সাধারণ বা ভারী হাইড্রোজেন রাখা যায় তাহলে হাইড্রোজেন পরমাণুগুলির গতিবেগ এত বেড়ে যাবে যে তারা পরস্পরের মধ্যে ঠোকাঠুকি শুরু করে দেবে। দুইটি পরমাণু কেন্দ্রক এই সময়ে জুড়ে গিয়ে একটি কেন্দ্রক অর্থাৎ নিউক্লিয়াসে পরিণত হবে এবং দুটি নিউক্লিয়াসের যোগফল হবে মিলিত নিউক্লিয়াসটির কিছু বেশী।

যখন পরমাণুর নিউক্লিয়াসে সংযোজন বিভাজনের ব্যাপারটা জানা ছিল না তখন বৈজ্ঞানিকদের কাছে এক মহা রহস্য ছিল সূর্য ও নক্ষত্রগুলির শক্তির উৎস। কোটি কোটি বছর ধরে তারা যে আলো ও তেজ বিকিরণ করে চলেছে সে আলো আসছে কোথা থেকে? কোনো জানা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এমন তো সম্ভব নয়। জানা প্রক্রিয়াতে যে সব শক্তি উৎপাদনের উপায় আছে তাতে তো পুড়তে পুড়তে তারাদের দেহ ছোট হয়ে ক্রমে বিলীন হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু কই তা হচ্ছে না। যখন তেজস্ক্রিয়তার আবিষ্কার হল, খোঁজ পাওয়া গেল পরমাণুর ভেতরের প্রচণ্ড শক্তির উৎসের কথা তখনই বোঝা গেল সূর্যের শক্তি উৎপাদনের রহস্য ঐ পরমাণুরই লীলা। সংযোজনের ফলে হাইড্রোজেন বদলে হয়ে যাচ্ছে হিলিয়ম এবং এই ভাবে যে প্রচণ্ড তাপের জন্ম হচ্ছে তার ফলে সম্ভব হচ্ছে, আরো সংযোজন। এইভাবেই চলে আসছে আবহমান কাল ধরে। এর ফলে অবলুপ্ত বস্তুর পরিমাণ মোটেই ধর্তব্যের মধ্যে নয়। সূর্যদেহ ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে আসছে এই নিয়ে জেমস জীনস প্রমুখ কিছু কিছু বৈজ্ঞানিকরা হৈ চৈ করলেও এখন এই থিওরী আর আলোচনার যোগ্য বলে মনে করা হয় না।

প্রশ্ন উঠতে পারে পরমাণুতে ধাক্কা লাগলেই যদি সংযোজন হয় তবে তা বড় আশঙ্কার কথা। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যেখানে অহোরাত্র সংযোজন হচ্ছে যেমন সূর্যের অভ্যন্তর—সে জায়গা মনুষ্য বাসের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। সুখের কথা সব পরমাণুতেই সংযোজন হয় না এবং সব অবস্থাতেও হয় না। এর জন্য চাই একটা বিশেষ অবস্থা এবং বিশেষ পরমাণু। সব সময় প্রকৃতিতে সংযোজন না ঘটার কারণ হল যথেষ্ট

পরিমাণে উত্তাপের অভাব। সংযোজনের প্রথম ও প্রধান চাহিদা হল উত্তাপ—অপার্থিব রকমের উত্তাপ—অন্তত দশ লক্ষ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

ডয়টেরিয়ম বা ভারী হাইড্রোজেন হল হাইড্রোজেনের একটি আইসোটোপ। সংযোজন ঘটার প্রকৃষ্ট স্থান হল হাইড্রোজেন। সমুদ্রের জলে সাধারণ ও ভারী হাইড্রোজেন আছে অপর্যাপ্ত পরিমাণে। এজন্য সমুদ্রকেই বলা হয় আমাদের সর্বোত্তম শক্তির উৎস। যদি সমুদ্র থেকে ডয়টেরিয়ম নিষ্কাশণের কোন সহজ ও সুলভ উপায় বার করা যায় তাহলে আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের বিদ্যুৎ সমস্যা নিয়ে কোনোদিনই ভাবিত হতে হবেনা।

সংযোজন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন শক্তি বিভাজন প্রক্রিয়ার চেয়ে হাজার গুণ বেশী। এই তথ্যটা বৈজ্ঞানিকেরা সর্বসাধারনের গোচরে আনার পর যা হবার তাই হল। অর্থাৎ যুদ্ধবিদরা চাইলেন এটাকে পরমাণু বোমার চেয়েও বিধ্বংসী বোমা তৈরির কাজে লাগাতে। পরীক্ষামূলক ভাবে ১৯৫২ সালে যে হাইড্রোজেন বোমা ফাটানো হয় তার শক্তি ছিল ৫০ লক্ষ টন ডিনামাইটের সমান। হাইড্রোজেন পরমাণুকে বিস্ফোরক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে বলে এর নাম হাইড্রোজেন বোমা।

বোমা তৈরি হল। তার পরের প্রশ্ন এবারে এই সব বোমা দিয়ে কি হবে? যুদ্ধের জন্য, সম্মানের জন্য, অপরের কাছ থেকে সম্ভ্রম আদায় করার জন্য, আত্মরক্ষার খাতিরে এগুলি তুলে রাখা হবে, না মানুষের উপকারে এদের কাজে লাগানো সম্ভব? মানুষের শুভবুদ্ধি এক্ষেত্রে আবার কার্যকর হল। ধ্বংস ও মৃত্যুর প্রয়োজনে অ্যাটম বোমার (সহজ প্রয়োগের বদলে, সৃষ্টি ও গঠনমূলক কাজে অ্যাটম বোমার) শক্তিকে প্রয়োগ করার কাজ শুরু হল। অনেক জনহিতকর কাজে এ-শক্তিকে ব্যবহার করা শুরু হল। পরমাণু থেকে বিদ্যুৎ বার করার খবর এখন আর নতুন নয়—তারাপুরে তা ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে—পরে আরো হবে, রাণাপ্রতাপ সাগর ও কলপক্কম এবং অন্যান্য স্থানে। এ ছাড়া পরমাণুর আরো অসংখ্য কাজ আছে। ধরা যাক মাটির অনেক নীচের স্তরে পেট্রোলিয়ামের খোঁজ পাওয়া গেছে,

যেখানে পৌঁছান রীতিমত কঠিন। তখন মাটির নীচে একটি পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটালেই কাজ উদ্ধার হচ্ছে—আর মাটির নিচে ফাটানোর জন্য তেজস্ক্রিয়তার প্রশ্নও উঠছে না। এমন কি বন্দরের সমুদ্রতল খুঁড়ে আরো গভীর করার কাজেও এই বিস্ফোরণ করা যেতে পারে কিনা ভেবে দেখা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন পরমাণু বিস্ফোরক অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ বিস্ফোরকের চেয়ে দামে সস্তা।



মহাকাশ

দুই ঃ মহাকাশ

১. কোয়াসার

হ্যামলেট তার বন্ধু হোর‍্যাশিওকে বলেছিল স্বপ্নেও ভাবা যায় না এমন সব বিস্ময়ের কথা। ভূতের প্রসঙ্গে বলা হলেও কথাটা খুবই সত্যি। কোয়াসার হল মাত্র ছ-সাত বছর আগে আবিষ্কৃত মহাবিশ্বের এমন এক বিস্ময় যা পৃথিবীর সমস্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কল্পনাকে স্তম্ভিত করেছে।

কোয়াসার বস্তুটি, বা বস্তুগুলি কি? এই নাম এসেছে ইংরাজী 'কোয়াসি স্টেলার রেডিও সোর্সস' এই কথাগুলির আদ্যক্ষর থেকে। অর্থাৎ মহাবিশ্ব থেকে আগত বেতার উৎস যাকে প্রায় তারা বলা যেতে পারে। প্রায় তারা বলার অর্থ কি? তারা কখন প্রায় তারা, আকাশে যা জ্বলজ্বল করে কেবল তাই কি তারা? আমাদের দৃষ্টির অগোচরে এমনকি মহাশক্তিশালী টেলিস্কোপেও দেখা যায় না এমন সব তারা আছে রেডিও টেলিস্কোপে যাদের সাড়া পাওয়া যায়। কিন্তু কোয়াসার নামে অভিহিত বেতার উৎসগুলি যে সাধারণ গ্যালাক্সি বা

নক্ষত্র পরিবার থেকে উদ্ভূত নয় একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে? কিসে এরা অসাধারণ ?

পনেরো কোটি আলোকবর্ষ জুড়ে প্রসারিত আমাদের ছায়াপথ এবং অ্যাণ্ড্রোমীডা নক্ষত্রপুঞ্জ যে আমাদের ছায়াপথের বাইরে এবং মহাবিশ্বের অসংখ্য গ্যালাক্সিগুলি যে পরস্পরের চেয়ে কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরে আছে এসব তথ্য আমরা জেনেছি উনিশশো পনেরো সালের পরে। উনিশশো চব্বিশ সালে এডউইন হাব্‌ল একশো ইঞ্চি টেলিস্কোপে অনেক অজানা রহস্যের হদিশ পান। তিনিই প্রথম সেই মারাত্মক তথ্য প্রকাশ করলেন, যার ফলে আমরা জানতে পারলাম যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ছায়াপথ, গ্যালাক্সি ও নক্ষত্রপুঞ্জ পরস্পরের কাছ থেকে তীব্র বেগে দূরে সরে যাচ্ছে। এই দূরে সরার বেগ আমাদের থেকে তাদের দূরত্বের সঙ্গে সমানুপাতিক। ছ-সাত বছর হল এমন সব নাক্ষত্রিক সমাবেশের খবর পাওয়া গেছে যারা আছে ব্রহ্মাণ্ডের দূরতম প্রান্তে, (যদিও প্রান্ত কথাটা এখানে বলা ভুল) এবং সেখান থেকে অবিশ্বাস্য বেগে চলে যাচ্ছে আরো দূরে। এই বেগ প্রায় আলোর বেগের অর্ধেক। এই ধাবমান নক্ষত্রপুঞ্জকেই বলা হয়েছে কোয়াসার। অকল্পনীয় দূরত্ব এবং অকল্পনীয় বেগের জন্যই কি এগুলি জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের চমৎকৃত করেছে ? ঠিক তা নয়। এদের অনেক রহস্য এখনো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। যেমন কয়েক হাজার আলোকবর্ষ দূরে এবং চওড়ায় লক্ষ আলোকবর্ষ এরকম কোন সাধারণ গ্যালাক্সির তুলনায় কোয়াসারগুলি অনেক ছোট। থি সি তিনশো তিয়াত্তর নামে একটি কোয়াসার আছে যা একশো কোটি আলোকবর্ষ দূরে অথচ চওড়ায় মাত্র দশ আলোকবর্ষ কিন্তু আমাদের জানা যে কোন গ্যালাক্সির থেকে এর ঔজ্জল্য একশো গুণ বেশী। এ এক দুর্জেয় রহস্য।

২. আলোর চেয়ে দ্রুত

মাত্র দশ আলোকবর্ষ ব্রহ্মাণ্ডের হিসেবে প্রায় ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। ঐরকম ছোট কোয়াসার এত দূর থেকে যে অসম্ভব শক্তি বিকিরণ করছে তার উৎস কি? জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই নিয়ে বহু জল্পনাকল্পনা করছেন। অনেকে বলছেন, কোয়াসারের বস্তুপুঞ্জ নিশ্চয় প্রচণ্ডভাবে ঘন, কেউ কেউ এই ঘটনা বোঝাবার জন্য অপর বস্তুর প্রসঙ্গ এনেছেন। কেউ বলছেন মহাকর্ষ এই শক্তি জোগাচ্ছে কেমন করে? যেমন দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় একটি চল্লিশ তলা বাড়ী নেহাতই স্থির নিশ্চল, মহাকর্ষজনিত শক্তি কিন্তু তার মধ্যে পূর্ণ। বাড়িটি হঠাৎ চুরমার হয়ে ভেঙ্গে পড়লে ঐ শক্তির প্রকাশ ঘটবে। বস্তুর উদয় কি করে হল তা যদিও আমাদের জানা নেই কিন্তু মহাবিশ্বে বস্তু ছড়ানো আছে এবং এই অবস্থায় ওদের মধ্যে আছে ঐ চল্লিশতলা অট্টালিকার মত সঞ্চিত মহাকর্ষজনিত শক্তি।

কোয়াসার নিয়ে একেই তো চিন্তার অবধি নেই, তার উপর হল আর এক দুর্বিপাক। কোয়াসারের ছবি তুলছিলেন ডক্টর টমাস ম্যাথিউস। দুশো সাতাশী নম্বর কোয়াসারের সঙ্গে আর একটি বস্তুর মধ্যে ছবিতে একটি আলোর রেখা পাওয়া গেল। এক বছর আগে ঐ সময়ের মধ্যে আলোর রেখাটি হয়েছে দীর্ঘতর। রেখা এতটা বেড়েছে যে কোয়াসারের দূরত্ব মেনে নিলে আলোর সীমিত গতিবেগ দিয়ে তাকে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। ম্যাথিউস তখন দুটি অনুমান করলেন। এক, কোয়াসারটি নিশ্চয় যা মনে করা হয়েছে তার চেয়ে ঢের বেশী কাছে, দুই, আলোর বেগ সীমিত নয়। দ্বিতীয় অনুমান মানতে গেলে আবার আপেক্ষিকবাদ ভুল প্রমাণ হয়ে যায়। কিন্তু গত ১৫ই জুলাই ক্যালিফোর্নিয়ার প্যাসাডেনা থেকে পাওয়া সংবাদে প্রকাশ—দুজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ম্যাথিউসের এই আবিষ্কারকে ভুল বলে ঘোষণা করেছেন, তাঁরা বলেছেন গত আঠারো বছর ধরে অনেক ছবি তুলেও তাঁরা ওরকম কোন আলোর সেতু দেখতে পাননি। হয়ত ম্যাথিউসের ক্যামেরায় কোন গণ্ডগোল ছিল। কাজেই আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরে।

৩. অন্য সৌরজগতের কথা

সম্প্রতি একটি আশ্চর্য সংবাদে সারা পৃথিবীতে মহা হৈ চৈ পড়ে গেছে। খবরটি হল মহাবিশ্বে, পৃথিবী থেকে লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে মানুষের মত একটি বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব।

সকলে এখনো কথাটা বিশ্বাসযোগ্য মনে করছেন না, কয়েকজন নামকরা জ্যোতির্বিজ্ঞানী তো এটা গাঁজাখুরী বলে উড়িয়ে দিতে চাইছেন। কেন না মহাবিশ্বের ফাঁকা জায়গাটি নানা রেডিও তরঙ্গে পরিপূর্ণ। সেই সব রেডিও সঙ্কেত সর্বদাই ধরা পড়ছে পৃথিবীর অবজারভেটরীগুলিতে। এর মধ্যে একটি বিশেষ সঙ্কেত যেরকম ভাবে পাওয়া যাচ্ছে তাতে সেটি স্বাভাবিক নয়, কৃত্রিম উপায়ে পাঠানো এই অনুমান করে এক সোভিয়েত বিজ্ঞানী খবরটি প্রচার করেন।

সমস্ত ব্যাপারটাই এখনও প্রমাণ সাপেক্ষ।

কিন্তু কথটা সত্যি হোক আর মিথ্যে হোক এর থেকে অন্তত মহাকাশ, বহির্বিশ্ব, সৌরজগত ইত্যাদি সম্বন্ধে আমরা নতুন করে সচেতন হলাম।

আমাদের এই সৌরজগতের বাইরে আছে অসংখ্য সৌরজগত, সেগুলি এত দূরে যে সাধারণ হিসাবে তাদের দূরত্ব মাপা সম্ভব নয়। বিভিন্ন তারা থেকে পৃথিবীর দূরত্ব তাই মাপা হয় সময়ের মাপে। সূর্য থেকে এখানে আলো আসতে লাগে আট মিনিট। শুনলে মনে হবে বেশ তাড়াতাড়িই তো কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভেবে দেখো আলোর স্বভাব কত জোরে যাওয়া—সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল গেলে আলো এক বছরে কতটা পথ অতিক্রম করে? একটু কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসলেই বেরিয়ে যাবে—এক বছরে ছয় ট্রিলিয়ন মাইল অর্থাৎ ছয়ের পিছনে বারোটা শূন্য। এই দূরত্বটাকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় এক আলোকবর্ষ বা এক লাইট ইয়ার। সুতরাং এই হিসাবে সূর্যকে প্রায় আমাদের পাশের বাড়ি বলা চলতে পারে। সূর্যকে বাদ দিলে আমাদের সবচেয়ে কাছের যে তারা (গ্রহ নয় কিন্তু), যেখান থেকে আলো আসতে লাগে প্রায় চার বছর। তার মানে সেই তারাটি

আছে পৃথিবী থেকে প্রায় চার আলোকবর্ষ দূরে। সেটা ক'মাইল হিসেব করে দেখতে পারো।

পৃথিবী থেকে এতটা দূরত্বের জন্য মনে হয় তারাগুলো এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু অন্য তারাদের সঙ্গে অবস্থান মাপলেই দেখা যাবে কোন তারাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নেই। পৃথিবী নিজের কক্ষপথে ঘুরছে, সুতরাং মাস ও ঋতু অনুযায়ী তারারাও জায়গা বদলাচ্ছে এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। তবে এই জায়গা বদলানোটা এক তারার সঙ্গে অন্য তারারও আপেক্ষিক ভাবে হচ্ছে। তারাদের গতি সম্বন্ধে বহুদিন ধরে চাঞ্চল্যকর সব তথ্য জানতে পারা গেছে।

প্রথমে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অনুমান ছিল ক্রমাগত আলো বিকীরণ করতে করতে একদিন তারাদের দেহ ঠাণ্ডা হয়ে একেবারে ফুরিয়ে যাবে। কিন্তু পরে এই মতটি ভুল বলে প্রমাণ হল যখন জানা গেল অ্যাটম জুড়ে শক্তি তৈয়ারী রহস্য। সূর্যের ভেতরে, সমস্ত তারায় তারায় দিনরাত এই প্রক্রিয়ায় তৈরী হচ্ছে শক্তি। সুতরাং যতই তাপ আর আলো বিকীরণ করুক নিজেরাই আবার সেগুলো তৈরি করে নিচ্ছে প্রত্যেক তারা—এরা প্রত্যেকেই স্বাবলম্বী। ফুরিয়ে যায় না কেউ।

এর পরে আর একটি মতের উদয় হল। এটা বলতে আরম্ভ করেন হাব্‌ল নামে এক বৈজ্ঞানিক। তিনি বললেন তারা, নীহারিকাপুঞ্জ সব কিছুই পরস্পরের কাছ থেকে প্রচণ্ড বেগে দূরে চলে যাচ্ছে। হিসেব করে জানা গেছে কোনো নীহারিকার দল সেকেণ্ডে ২৪০০ মাইল বেগে পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কোনোটি আরো জোরে—৪০০০, ৯০০০, এমন কি সেকেণ্ডে ১২০০০ মাইল বেগে! এই রেটে চলতে থাকলে শেষকালে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কি অবস্থা হবে ভাবা মোটেই সুখের নয়।

প্রসারণের ঠ্যালায় ধরো যদি সূর্যও ছুটে পালায় তখন আমাদের কি অবস্থাই না হবে। যাই হোক তোমরা শুনলে আশ্বস্ত হবে যে এই মতটিও শেষ পর্যন্ত ভুল প্রমাণ হয়ে গেল।

তার পরের মত হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কোনো দিনই লয় পাবার মতো একটা স্থির অবস্থায় পৌঁছতে পারে না। পর্যায়ক্রমে এটা বাড়ছে আর কমছে—আর এইরকমই হতে থাকবে অনন্তকাল ধরে। শুনে খানিকটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচা গেল।

এর পরের প্রশ্ন হল অন্য কোথাও প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভব কিনা। এতকাল সকলের ধারণা ছিল যে আমাদের সৌরজগতের অন্য গ্রহগুলোর মধ্যে একমাত্র মঙ্গলগ্রহেই জীবের বাস অসম্ভব নয়। সূর্যের সবচেয়ে কাছে আছে বুধ, তারপরে শুক্র, তারপরে আমরা। বুধ বা শুক্র গ্রহে থাকতে হলে আমরা পুড়ে ঝলসে শেষ হতাম। সূর্য থেকে আরো দূরে যেমন বৃহস্পতিতে থাকতে হলে জমে বরফ হতাম। কাজেই পৃথিবীতে আমরা মাঝে মাঝে শীতে গ্রীষ্মে কষ্ট পেলেও মোটের উপর এক রকম ভালোই আছি বলা যায়। মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দারা, যদি সেখানে সত্যিই অদ্ভুত কোনো জীবের বাস থাকে—কেন মাঝে মাঝে পৃথিবীতে বেড়াতে আসে না এ নিয়ে অনেকে মাথা ঘামায়। তবে এখন যে রকম রেটে কাজ হচ্ছে, খুব শিগগিরি যে পৃথিবীর মানুষ মঙ্গল গ্রহে গিয়ে হাজির হবে তাতে আর সন্দেহ নেই। তবে সম্প্রতি রুশ বৈজ্ঞানিকেরা বলেছেন মঙ্গল গ্রহে যদি কেউ বাস করে, তারা আমাদের মতো বায়ুভুক প্রাণী নয়; রকেটের সঙ্কেত থেকে মনে হয় কেউ বাস করেনা।

কিছুদিন আগে পর্যন্তও মঙ্গল গ্রহের মানুষ কিম্বা উড়ন্ত চাকীতে রহস্যজনক কিছু দেখা গেছে বললেই সকলের গা শিউরে উঠত। কিন্তু এখন অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়েছে যে, চাঁদ বা মঙ্গল সম্বন্ধে আমরা আর ততটা উৎসাহিত হই না। এই যে নতুন খবরটা প্রচার হয়েছে—অন্য সৌরজগতের জীব সম্বন্ধে—এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে মানুষের চিন্তা আর কল্পনা আজ কোথায় গিয়ে পৌঁছেচে।

আমাদের এই সৌরজগত যেমন করে তৈরী হয়েছে মনে করা যাক অন্য সৌরজগতগুলিও সৃষ্টি হয়েছে তেমনি ভাবেই। আর তাই যদি হয় তাহলে যে করে বিভিন্ন গ্রহ, উপগ্রহ, আমাদের এই পৃথিবী গড়ে উঠল ঠিক সেই রকম ভাবে পৃথিবীর মত আরেকটি গ্রহ লক্ষ লক্ষ

আলোকবর্ষ দূরে অন্য এক তারার সৌরজগতে তৈরি হতে পারা কি এতই অসম্ভব ? প্রাণের সৃষ্টি হবার মত সব রকম উপাদান সেখানেও থাকতে ক্ষতি কি ? বিবর্তন হল সেখানেও বিকাশ লাভ করল উন্নত শ্রেণীর সভ্যতা। জানলাম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমরা একলা নই। এখন অন্য সৌরজগতবাসী সেই আত্মীয়রা দেখতে কেমন, কি করে এসব জানবার উপায় কি ? তারাই আমাদের রেডিও সঙ্কেত পাঠাচ্ছে একথা যদি ঠিক হয়, তাহলে আমরাও প্রত্যুত্তর পাঠাব। কিন্তু খবর আদান-প্রদান হতে হতে কেটে যাবে কত লক্ষ বছর। এত দূরের পথ এক জীবনে পার হব কি করে ? এইটাই বোধ হয় ভবিষ্যত বৈজ্ঞানিকদের কঠিনতম সমস্যা।

৪. তারার আয়ু

অনেকদিন আগে এক সবজান্তা ব্যক্তি ছিল বলে একটি গল্প শোনা যায়, তার কাজই ছিল সকলকে ঠকিয়ে বেড়ানো, পৃথিবীতে এবং তার বাইরেও হেন জিনিস নেই যা তার অজানা—তার এই বড়াই শুনে একদিন সে দেশের রাজা তাকে ডেকে পাঠালেন। রাজা তাকে বললেন আমি তোমাকে তিনটি প্রশ্ন করব, উত্তর দিতে পারো ভাল, না দিতে পারলে তোমার মাথা কেটে নেওয়া হবে। সবজান্তা তাতেই রাজি। প্রশ্নগুলির মধ্যে একটি ছিল আকাশে কত তারা ? উত্তর শুনে রাজা মশায়ের আর কিছু বলার থাকে না। সবজান্তা বলে তিন কোটি চুরাশি লক্ষ কুড়ি হাজার তিনশো পাঁচ—বিশ্বাস না হয় গুণে দেখুন।

একথা শুনে রাজামশাই যে বিলক্ষণ বিপদে পড়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। যদিও এটা গল্প, কিন্তু এমন একটা সংখ্যা বিশ্বাস করার মত কিনা জিগেস করলে অনেকেরই ভ্যাবাচাকা লেগে যাবে। মেঘশূন্য পরিষ্কার রাতে আকাশের দিকে তাকালে খালি চোখে কত তারা দেখা যায় তার একটা মোটামুটি হিসেব অবশ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন, যদিও তার সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিসীমানার বাইরে যে সব নক্ষত্র আছে তাদের সংখ্যার কোন তুলনা হয় না। এর মধ্যে আবার

আর একটা ব্যাপার আছে। পৃথিবীর এই পিঠ থেকে আকাশের যতগুলো তারা একজন লোকের নজরে পড়েছে পৃথিবীর ওপিঠের অপর একজনের নজরে সেগুলো পড়ছে না। পৃথিবী থেকে সাদা চোখে প্রায় ছয় হাজারের মত তারা দেখতে পাওয়া যায়। ছোট দুই ইঞ্চি লেন্স-ওয়ালা টেলিস্কোপ দিয়ে দেখলে এই সংখ্যা বেড়ে হবে তিন লক্ষ। প্রথম টেলিস্কোপ তৈরি করেছিলেন গ্যালিলিও, ১৬১০ সালে। সেই যন্ত্রে তিনিই প্রথম দেখলেন জ্বলন্ত বাষ্পের মত ছায়াপথ বস্তুটি আসলে অনেকগুলো তারার সমষ্টি। আজকাল অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে এতদূর পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে শুনলে হয়তো সেকালের সেই সবজান্তা ব্যক্তিরও মাথা ঘুরে যেত। শুধু দেখেই নয়, আজকাল ছবি তোলা হচ্ছে এমন সব তারার, যেগুলো আমাদের থেকে যে কত কোটি কোটি মাইল দূরে আছে তা চিন্তা করলে স্তম্ভিত হতে হয়। এই সমস্ত তারার সংখ্যা হিসেব করে দেখা হয়েছে দশ হাজার কোটি।

এই যে আকাশ ভরা অসংখ্য তারা সমস্ত ক্ষণ জ্বলছে নিবছে—এরা কি সত্যি সত্যিই একদিন নিবে যেতে পারে? কোনো কোনো তারা অবশ্য স্থির আলোর শিখার মত জ্বলজ্বল করে, কিন্তু যে সব তারা মিটমিটে, খালি চোখে এই দেখা যায় এই দেখা যায় না, মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় তারা সত্যি সত্যি আছে নাকি—এদের ভেতরের রহস্যটা কি? একালের সবজান্তারা বলেন সূর্যের ভেতরে যেমন করে প্রচণ্ড চুল্লীতে পারমাণবিক শক্তি তৈরি হচ্ছে, যার নকল করে পৃথিবীতে তৈরি হয়েছে হাইড্রোজেন বোমা—তারাদের ভেতরেও ঠিক সেই জিনিসই ঘটছে। নিজেদের শরীরের উপাদানের মধ্যেই আছে এদের অকল্পনীয় শক্তির উৎস। হিলিয়ম বা হাইড্রোজেনের অ্যাটম ভয়ঙ্কর উত্তাপের প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে ঘুরতে নিজেদের মধ্যে ধাক্কা খেয়ে সংযোজিত হচ্ছে—প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সঙ্গে দুটি অ্যাটমের কেন্দ্র জুড়ে হচ্ছে এক—এই এক হবার প্রক্রিয়ার সময় খানিকটা উপাদান উড়ে যাচ্ছে—শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে—সংক্ষেপে এই হল 'থার্মোনিউক্লিয়ার রি-অ্যাক্সন'। বাংলায় একে বলে তাপকেন্দ্রীণ

বিক্রিয়া। এই বিক্রিয়া চলেছে যুগ যুগ ধরে, কিন্তু অনন্তকাল ধরে চলবে সেকথা বুকে হাত দিয়ে কোনো তারাই বলতে পারে না। বরং সাক্ষ্যপ্রমাণ নিয়ে আজকালকার সর্বজ্ঞ বিজ্ঞানীরা বলছেন যে তারাদেরও আয়ুষ্কাল আছে। হতে পারে মানুষের জীবনের মাপকাঠিতে অনন্তকাল, কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খেলাঘরে তা কিছুই নয়। ক্রমাগত পুড়তে পুড়তে তারাদের শরীর ছোট হয়ে আসছে—যেমন হচ্ছে সূর্যের। এতে আমাদের ভয় পাবার কারণ নেই। কোটি কোটি বছর পরে পৃথিবী শীতে জমুক বা গরমে পুড়ুক তাতে আমাদের কি-ই বা ক্ষতিবৃদ্ধি!

কোটি কোটি বছর ধরে ক্রমাগত জ্বলবার পর তারা-দেহ ক্রমে সঙ্কুচিত হয়ে আসবে, জ্বালানিও কমতে থাকবে সঙ্গে সঙ্গে। এই ভাবে লক্ষ লক্ষ বছর কেটে যেতে কোনো বাধা নেই। তারার মৃত্যু দু-একদিনের ব্যাপার নয়।

বাইরে থেকে লোকে কি করে বুঝবে যে তারার মরণকাল ঘনিয়ে এসেছে? বোঝার একটা প্রধান উপায় হল, তারার জ্বলজ্বল করা বা মিটমিট করার ধরণটি। পরিধি যেমন ছোট হয়ে আসবে তেমনি আলোর বিকীরণ প্রতিদিন হবে এক একরকম, কখনো হঠাৎ বেশী হয়েই একেবারে কম—এই করতে করতে তুবড়ী ফেটে যাওয়ার মতো সমস্ত তারাটি একদিন আলোর ফুলকি হয়ে ধ্বংস পেয়ে যাবে—কি বিচিত্র বর্ণের ঝলকানি দেখা যাবে সে সময় ভাবতে গেলে আমাদের কল্পনাও হার মেনে যেতে বাধ্য।

যে তারা যত বড়, তার ঔজ্জ্বল্য সেই অনুপাতে অনেক বেশী। একটা অঙ্কের হিসাব কষে দেখা গেছে যদি কোনো তারার দেহ হয় সূর্যের দ্বিগুণ, তবে তার দীপ্তি হবে দুগুণ বেশী না হয়ে আটগুণ বেশী। পৃথিবী থেকে এই ঔজ্জ্বল্য যে দূরত্ব অনুযায়ী কম বেশী মনে হবে, সেকথা না বললেও চলে। একটি তারা অন্য একটির চেয়ে বেশী জ্বলজ্বলে হওয়ার কারণ কি? দূরত্বের কথা না হয় এখানে বাদ দেওয়া গেল। যে তারা যত বেশী হারে তার জ্বালানী পুড়িয়ে খরচ করছে তার দ্যুতিও হবে তত বেশী; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে রাখা

দরকার যে সেটা হচ্ছে নেহাৎ মুর্খের মত বেহিসেবী কাজ। কেননা জ্বালানী ফুরিয়ে গেলেই তো তারার আয়ু খতম!

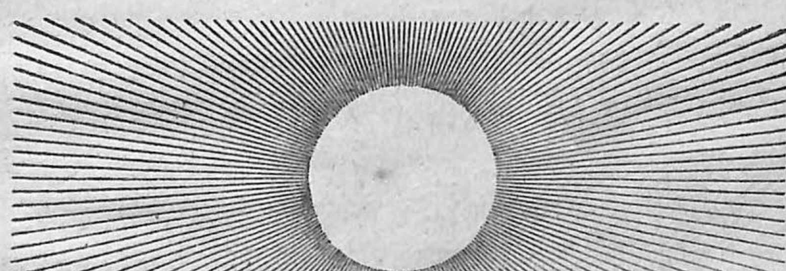
তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই রকম, যে তারা আকারে যত বড় সে জ্বলছে তত বেশী পরিমাণে এবং ফুরিয়েও আসছে তাড়াতাড়ি। সৃষ্টির আদি যুগে এমনি করে কত প্রকাণ্ড তারা তৈরি হয়েছে আর বিনষ্ট হয়েছে তার হিসেব নেই। তাদের চেয়ে অনেক ছোট আকারের একই সময়ে তৈরি হওয়া তারা, হিসেব করে জ্বালানী পুড়িয়ে পুড়িয়ে এখনও বেঁচে আছে, আমাদের চোখে তাদের আলো ধরা দিচ্ছে এখনও।

আমাদের ছায়াপথে কিছু এমন তারা আছে যাদের ঔজ্জ্বল্য দেখে আশঙ্কা হয় এরা দশ কোটি বছরের বেশী টিঁকে আছে কি করে। কিন্তু টিঁকে যখন আছে তখন একটা জিনিস প্রমাণ হয়, সেটি হল এরা নবাগত, অনেক পরে এদের জন্ম হয়েছে। তা না হলে এদের যা জ্বালানীর হার, তাতে বিলয় পেতে খুব বেশী বিলম্ব নেই; বিলম্ব মানে অবশ্য মহাকাশের ক্যালেণ্ডারে।

ইংরেজ জ্যোতির্বিদ ও দার্শনিক সার আর্থার এডিংটন একবার বলেছিলেন, 'তারার মতো সহজ ব্যাপার আর কিছু নেই। এদের আদ্যোপান্ত বুঝে ফেলা মোটেই শক্ত নয়।' শুনলে অবাক হবার মতো কথা বৈকি। তারার মতো সহজ ব্যাপার আর কিছু নেই—তারা সম্বন্ধে যা কিছু জ্ঞাতব্য সব আমাদের নখদর্পণে—এসব কিন্তু মোটেই বৈজ্ঞানিকের বাজে বড়াই নয়। তারা সম্বন্ধে কি কি জানা গেছে দেখাই যাক। প্রথমত জানা গেছে সূর্যের ভেতরের যা তাপ, তার চেয়ে বহুগুণ বেশী উত্তপ্ত এদের বাইরে ও ভেতর। এমনই প্রচণ্ড গরম যে তাতে কোনো পদার্থই কঠিন হয়ে থাকতে পারে না, গলে গ্যাস হয়ে যায়। খুব খুঁতখুঁতে বিজ্ঞানের ছাত্র অবশ্য বলবেন পদার্থের এই অবস্থা হল না কঠিন, না তরল, না গ্যাসীয়—এ এক চতুর্থ অবস্থা, একে বলে প্লাজ্‌মা। নামটা যাই হোক না কেন, মানেটা বুঝতে সুবিধে হবে, যদি বলি যে লোহার মত কঠিন দ্রব্য গলিয়ে গ্যাস বানাতে লাগে তিন হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের তাপ, এ

হেন লোহাও সেখানে প্লাজ্‌মা হয়ে বিচরণ করছে। তবেই ভেবে দেখ কি ভয়ানক অবস্থা সেখানকার। আমাদের যখন এই বিকট উত্তাপের কথা ভেবে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, বিজ্ঞানীরা কিন্তু সেদিক দিয়ে মোটেই চিন্তা করছেন না, তাঁরা বলবেন, তবে তো ব্যাপারটা বেশ জলবৎ তরলম (কিম্বা প্লাজমাবৎ তরলম) হয়ে গেল। একবার গ্যাস হয়ে গেলে, পদার্থের নড়াচড়া সম্বন্ধে যে সব প্রাকৃতিক নিয়ম জানা আছে, তার মধ্যে ধরা পড়ে গেল সব—লোহাই বল, আর হিলিয়ম বা অন্য কোনো মৌলিক পদার্থ যা দিয়ে তারাদের দেহ তৈরী, যাই বল না কেন।

কিন্তু সহজ বললেই তো হল না, সহজ কথা আবার অনেক সময় খুব সহজে বলা শক্ত। তারাদের সম্বন্ধে জানবার এত জিনিস আছে যে মাত্র কয়েক পাতায় তা আঁটানো অসম্ভব। তোমরা কৌতূহলী হলে, পরে এ বিষয়ে আরো চর্চা করে দেখতে পার। আমাদের দেশের মেঘনাদ সাহা খুবই অল্প বয়সে বিখ্যাত হয়েছিলেন, সূর্য-তারা সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের জন্য। তোমরা বড় হয়ে সে সব বুঝে দেখো—ভারী আশ্চর্য লাগবে।



আবহাওয়া

তিন ঃ আবহাওয়া

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

১. দিনরাতের হিসেব

চব্বিশ ঘণ্টায় যে একদিন হতেই হবে এমন কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নেই। সেই এতদিনে মানে চন্দ্রলোকে ঘুরে আসার পর স্পষ্ট বোঝা গেল। কোন জরুরী কাজে কাউকে যখন চাঁদের কলোনীতে যেতে হবে তখনকার জন্যে কিন্তু অন্য একটা ডায়েরী সঙ্গে নেওয়ার প্রয়োজন। সে ডায়েরীতে প্রত্যেক মাসে থাকবে দুদিন করে, অর্থাৎ চব্বিশটা পাতাতেই বছর শেষ। "তিরিশ দিনেতে হয় মাস সেপ্টেম্বর" ইত্যাদি লাইনগুলো আউড়ে কবে ত্রিশ আর কবে একতিরিশ এসব হিসেব করার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। কিন্তু আবার অন্যদিকে মুস্কিল পৃথিবীর ক্যালেণ্ডার আর চাঁদের ক্যালেণ্ডার দুটোরই হিসেব রাখতে হবে। ততদিনে সবই অভ্যেস হয়ে যাবে, আশা করা যায়।

অথচ, আমরা প্রায় ভুলেই গিয়েছি যে চাঁদের কথা বাদ দিয়েও, এই পৃথিবীতে সব সময়ে বারো ঘণ্টা করে দিন আর রাত ছিল যখন নিজের অক্ষরেখার চারিদিকে পৃথিবীর আবর্তন ছিল অনেক দ্রুত, আর

সেই বেগ আস্তে আস্তে কমেছে। সত্যিই কি পৃথিবীর আবর্তন-বেগ আস্তে আস্তে কমে আসছে? এবং একদিন আমরা একেবারে থেমে যাব? যদি ঘোরার বেগ ক্রমশ কমে আসে তবে দিনগুলো আর রাতগুলো হবে আর একটু করে লম্বা এটা ঠিক। তখন বছর আর মাসের হিসেব কি হবে এসব আমাদের ভেবে দেখা দরকার।

আজ থেকে চারশো কোটি বছর আগে সূর্য থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা পৃথিবীর পাক ছিল প্রায় লাট্টুর মত জোরে। চব্বিশ ঘণ্টায় একবারের বদলে এই পাক ছিল তখন দশ ঘণ্টায় একবার। তার মানে সূর্য উঠতে না উঠতেই বোঁ বোঁ করে মাথার উপর, তারপর হুড়োহুড়ি করে পশ্চিমে হেলে, দেখতে দেখতে একেবারে সন্ধ্যে! দশঘণ্টায় এক পাক মানে পাঁচ ঘণ্টা আলো পাঁচ ঘণ্টা অন্ধকার। এই হিসেবে চলতে গেলে রোজকার কাজকর্মের জন্য কি পরিমাণ দৌড়াদৌড়ি করতে হবে ভাবতেও মাথা ঘুরে যায়! তবে সে সময় পৃথিবীতে মানুষ ছিলনা এই রক্ষে।

চারশো কোটি বছর কেটেছে। এর মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে পৃথিবীর গায়ে। প্রধান পরিবর্তন ঘটে গেছে পৃথিবীর গায়ে। প্রধান পরিবর্তন বলা যেতে পারে এই ঘোরার বেগ কমে যাওয়ার ব্যাপারটা। কি করে দশ ঘণ্টাকে বাড়িয়ে চব্বিশ ঘণ্টায় নিয়ে যাওয়া হল? পৃথিবী কি নিজে থেকেই ধীরগতি গেল? বিজ্ঞানীরা হিসেব করে বার করেছেন এর কারণ সমুদ্রের জলে জোয়ার ভাঁটা। জোয়ারের ধাক্কা যখন এসে উপকূলে লাগে তখন ঘর্ষণের ফলে জন্মায় তাপ। তাপ এক ধরণের শক্তি আমরা জানি। এই শক্তি তখন পৃথিবীর গতির উপর ব্রেকের কাজ করে। ভালো করে ভেবে দেখতে গেলে দেখা যায় চাঁদই ব্রেকের কারণ। এই রকম বহুদিন ধরে চলছে। সূক্ষ্ম হিসেবে দেখা যাচ্ছে ধীরে, অতি ধীরে পৃথিবী সূর্যের দিকে এগিয়ে আসছে আর চাঁদ যাচ্ছে পৃথিবী থেকে সরে! চাঁদ থেকে পৃথিবীর দূরত্ব যত বাড়বে তত চাঁদের উপর সূর্যের অভিকর্ষ হবে প্রবল। ক্রমে চাঁদ পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে নবম গ্রহ হয়ে সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ শুরু করবে।

চাঁদ যে হারে দূরে সরছে তার থেকে হিসেব করে দেখা গেছে দুশো কোটি বছর আগে চাঁদের উচিত ছিল পৃথিবীর খুব কাছে থাকা। এদিকে উল্কা প্রভৃতির বয়স গুণে দেখা যায় সৌরজগতের বয়স চারশো কোটি বছরের বেশী নয়—তবে এই বাকি দুশো কোটি বছর চাঁদ কোথায় ছিল ?

২. সূর্য ও শক্তি

পনেরোই এপ্রিল উনিশশো আটষট্টি। হঠাৎ কোন এক অজ্ঞাত কারণে পৃথিবীর মোটর চালকরা ক্রমাগত গাড়ীতে ধাক্কা লাগাতে লাগলেন। সংবাদে প্রকাশ ঐ দিন সূর্যদেহে আকস্মিক আলোড়নের ফলে প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক শক্তি সূর্যদেহ থেকে বেরিয়ে এসে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে আঘাত দেয়, ফলে মানুষের ইন্দ্রিয়গুলি অকেজো হয়ে পড়ে।

উপরের খবরটি কোন বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাস থেকে নেওয়া এ রকম মনে হওয়া বিচিত্র নয়। এটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। অনেকের হয়ত মনেও থাকতে পারে। মোটর দুর্ঘটনার সংখ্যাবৃদ্ধি এবং সূর্যদেহে আলোড়ন এই দুই-এর মধ্যে নাকি সম্পর্কও নির্ণয় করেছেন কোন এক সোভিয়েত বিজ্ঞানী। খবর মাত্রেই যে ধ্রুব সত্য হবে এমন কোন কথা নেই। তাছাড়া এটা তাঁর শুদ্ধমাত্র অনুমানও হতে পারে। আমাদের স্নায়ুগুলি অতি সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক তরঙ্গে সাড়া দেয় একথা ঠিক, তবে তাঁর অনুমান সত্য হলে সেই ভয়াবহ চৌম্বক ঝড়ের দিনে আমাদের প্রত্যেকেরই স্নায়ুতন্তুগুলি অসাড় হয়ে যেত। সকলেই তাহলে ডান দিকে যেতে গিয়ে বাঁ দিকে চলে যেতেন বা জলের গ্লাস মুখে না তুলে ভুল করে মাথায় ঢেলে ফেলতেন। সে রকম কোন ঘটনা ঘটেছে বলে আমাদের কানে আসেনি।

তবে এ বিষয়ে কোন ভুল নেই যেন কোটি আটাশ লক্ষ মাইল দূরে হলেও সূর্যের সঙ্গে আমাদের রক্তের বন্ধন। পরমাণুশক্তি ছাড়া আর যত রকমের শক্তির উৎস আছে, তেলই বলুন, কয়লাই বলুন, জোয়ার ভাঁটা বা জল থেকে উৎপন্ন শক্তিই বলুন, এ সবই সূর্য কিরণের

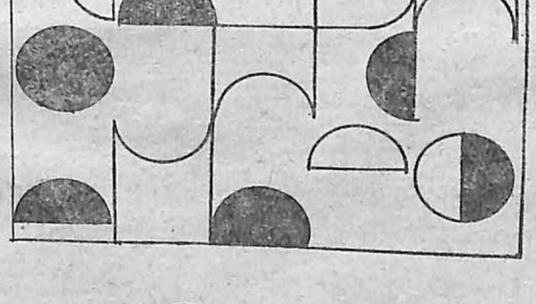
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ফল। সূর্যের উত্তাপ আর আলোতে প্রাণ পাচ্ছে আমাদের বিশ্বজগৎ, আকাশে মেঘ, মেঘ থেকে বৃষ্টি, নদীতে জল সবই ঘটছে সৌর শক্তির কৃপায়। এত আলো আর তাপবিকিরণ করেও কিন্তু সূর্য ফুরিয়ে যাচ্ছে না, কেননা প্রতিনিয়ত নিজের মধ্যে শক্তি উৎপাদনের চমৎকার ব্যবস্থা আছে সূর্যদেহের। পরমাণু কেন্দ্রকের যে ভাঙ্গাগড়া চলছে এর অতি উত্তপ্ত অন্তঃপ্রদেশে, যার নকলে পৃথিবীতে মহা শক্তিশালী হাইড্রোজেন বোমার সৃষ্টি—সেটাই হল সূর্যের অন্তহীন শক্তির উৎস। সূর্যদেহে আলোড়ন সর্বদাই হচ্ছে, হাইড্রোজেন পরমাণুতে সংযোজন হয়ে তা হয়ে যাচ্ছে হিলিয়ম। প্রাচীনকাল থেকেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ দেবতা বলে সূর্যের যে খ্যাতি, এখন দেখা যাচ্ছে তা নেহাত অকারণ নয়। পৃথিবী থেকে সূর্যদেহের বাইরের যা দৃশ্য চোখে পড়ে তাতে কোন কোন জায়গার ঔজ্জ্বল্য কখনো মনে হয় চারপাশের থেকে কম। এইগুলিকে বলা হয় সৌরকলঙ্ক। এগুলির সংখ্যা বাড়তে কমতে দেখা গেছে। সৌরকলঙ্কের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রেও প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে।

৩. সূর্য ও রাষ্ট্রবিপ্লব

শোনা যায় ফরাসী বিপ্লবের বছরে নাকি অনেক বেশী সংখ্যায় সূর্যকলঙ্ক দেখা গিয়েছিল। আবার রুশ বিপ্লবের বছরেও নাকি অনুরূপ ব্যাপার ঘটেছিল। তাহলে কি সূর্যদেহে আলোড়নের সঙ্গে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির কোন যোগসূত্র আছে? বিজ্ঞানী জর্জ গ্যামো ঠাট্টা করে বলেছিলেন, আমেরিকান বিপ্লবের বছরে কিন্তু সৌরকলঙ্কের সংখ্যা ছিল খুবই কম। তাহলে কি আমরা বুঝবো যে কেবলমাত্র বিশেষ ধরণের বিপ্লবের সঙ্গেই সূর্যদেবের সম্পর্ক আছে?

এ রকম যুক্তি দিয়ে কিছুই প্রমাণ হয় না। তবে মাঝে মাঝে যখন সূর্যের কোন কোন অঞ্চল স্বাভাবিক অবস্থার চেয়েও বেশী বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, গ্যাস ছুটতে থাকে সেকেণ্ডে একশো মাইল বেগে তখন

পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রে তার প্রতিক্রিয়া না হয়েই পারে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় একটি মজার ঘটনা ঘটেছিল। ইংলণ্ডের উপকূলে একটি রেডার কেন্দ্রে পাওয়া গেল জার্মান বোমারু বিমান আসার সঙ্কেত, সঙ্কেতগুলি কিন্তু পশ্চিম দিক থেকে। পশ্চিমে আটলান্টিকের ওপার থেকে জার্মান বোমারু বিমান ? এ কি রহস্যময় ব্যাপার। সাজ সাজ রব পড়ে গেল, কিন্তু কই কোন বিমানেরই দেখা নেই। পরে আসল কারণ বোঝা গেল। সময়টা ছিল বিকেল। তখন সূর্য আটলান্টিকের ওপারে অস্ত যাচ্ছে। সেদিক থেকে হঠাৎ প্রচণ্ড চৌম্বক ঝড় এসে আয়নমণ্ডলে আলোড়ন সৃষ্টি করে, ফলে রেডারের বেতার সংকেত ভুল দিকনির্দেশ করেছিল।



কারিগরী ও প্রযুক্তি বিজ্ঞান

চার : কারিগরী ও প্রযুক্তি বিজ্ঞান

১. চাকাহীন যান

কথায় বলে সভ্যতার চাকা। চাকা বাদ দিলে সভ্যতার কতটা বাকি থাকে? অতি আধুনিক যন্ত্রবিদ বলবেন যানবাহনের ক্ষেত্রে চাকা ছাড়া সভ্যতার গতি চালু তো থাকবেই এমনকি দিন দিন আরো দ্রুত হবে। অতিশব্দিক যান তো চাকা ছাড়াই আকাশে চলছেই কিন্তু মাটিতে? নিম্নোক্ত রোমহর্ষক খবরটি ফরাসী পত্রিকা সিঁয়াস এভির মার্চ সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত।

মোটর গাড়ীর চাকার বাঁধন থেকে অবশেষে আমাদের মুক্তি দেবার জন্য আবির্ভূত হয়েছে এয়ারো ট্রেন—আকাশ ট্রেন। সামনের বছর থেকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এই ট্রেন চালু হবে বলে প্রকাশ। এই ট্রেন এমন গতিবেগবিশিষ্ট যা এতদিন কেবল প্লেনের পক্ষেই সম্ভব ছিল। ৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ফ্রান্সের পরিবহন দপ্তরের সঙ্গে এয়ারো ট্রেন সোসাইটি অফ বার্লিন অ্যাণ্ড কোম্পানীর এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। নিউ অর্লিয়েন্স

থেকে প্যারিসমুখী কংক্রীটের ট্র্যাক তৈরি হচ্ছে, আশা করা যায় এ বছরই প্রথম কুড়ি কিলোমিটার রেলপথ সম্পূর্ণ হবে। কাজ ঠিকমত অগ্রসর হলে শীঘ্রই ফ্রান্স হবে পৃথিবীর দ্রুততম রেলপথের অধিকারী। ফরাসী নাগরিকেরা কুড়ি মিনিটে একশো কিলোমিটার পথ অতিক্রম করার দুর্লভ সৌভাগ্য অর্জন করবেন।

এই ট্রেনে চাকা নেই। মাটি থেকে কয়েক সেন্টিমিটার উঁচু রিইনফোর্সড কংক্রীটের এই রেলপথের সঙ্গে আমাদের পরিচিত রেললাইনের কোনই সাদৃশ্য থাকবে না। গাড়ীগুলি হবে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত, সাউণ্ডপ্রুফ এবং আরামপ্রদ। এর গতি হবে ঘণ্টায় আড়াইশো কিলোমিটার। গত বছর ডিসেম্বর মাসে যে মডেল ট্রেন চালিয়ে দেখা হয় তার গতি উঠেছিল ঘণ্টায় তিনশো পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার অবধি। দুবছর ধরে অনেক পরীক্ষা চালানো হয়েছে এই অভিনব ব্যবস্থাকে নিখুঁত করার উদ্দেশ্যে। এই সময়ের মধ্যে আকাশট্রেন আঠারো হাজার কিলোমিটার পথ চলেছে এবং সাড়ে পাঁচ হাজার ব্যক্তি এতে চড়ার সুযোগ পেয়েছেন।

আইডিয়া নতুন নয়—এখন কার্যকর হলেও চাকাহীন গাড়ীর কল্পনা কিন্তু একশো বছরের পুরানো। ইংলণ্ডে স্টীম ইঞ্জিন চালু হবার মাত্র তিরিশ বছর পরে, ১৮৫৪ সালে লুই ডমিনিক জিরাড নামে এক ফরাসী বৈজ্ঞানিকের মাথায় এক নতুন চিন্তার উদয় হয়। তিনি ভাবলেন গাড়ী থেকে যদি চাকা বাদ দিই তবে কেমন হয়? চাকাহীন যে গাড়ীর কল্পনা তিনি করলেন তাতে হাওয়া বা জল জাতীয় তরল কোন পদার্থের সাহায্যে ট্র্যাকশনের কথা ভাবা হয়েছিল। চাকা থাকলেই ফ্রিকশন (ঘর্ষণ), তাতে শক্তির অপচয়। দুটি ধাতব পদার্থে পরস্পরের সংঘর্ষে না এনে একটিকে সরিয়ে দেওয়া যাক। হাওয়ার চেয়ে আবার জলের ফ্রিকশন আরো মৃদু, মোটে অনুভব করাই যাবে না। জিরাড এই নিয়ে পরীক্ষা করে দেখছিলেন। তাঁর পরীক্ষার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে তৃতীয় নেপোলিয়ান তাঁকে রেলপথ তৈরি করতে অনুমতি পর্যন্ত দেন। ভাগ্য বিরূপ না হলে হয়ত এতদিনে চাকাহীন ট্রেন আমাদের পরিচিত ব্যাপার হয়ে

দাঁড়ত। কিন্তু ইতিমধ্যে ১৮৭০ সালে বেধে গেল যুদ্ধ। জিরাড নিহত হলেন।

জিরাডের সহযোগী ছিলেন শ্রীযুক্ত ব্যারি। তিনি হাল ছাড়লেন না। ১৮৮৯ সালে তিনি চাকাহীন ট্রেন তৈরি করলেন। ট্রেনটি খাড়া করা হল এক ফাঁপা সুড়ঙ্গসদৃশ পথের উপর, তার মধ্যে ছিল চাপিত (কমপ্রেসড) বাতাস। জেট চালিত ট্রেনের কল্পনাও তিনিই প্রথম করেছিলেন। ১৯৩২ সালে আমেরিকানরা জেট-প্লেনের যে কৌশল উদ্ভাবন করেন তার প্রকৃত জনক কিন্তু ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর এই ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার।

চাকাহীন ট্রেনের কথা তারপরে লোকে ভুলে গেল। সম্প্রতি আবার বিস্মৃতির গর্ভ থেকে একে খুঁড়ে বার করা হয়েছে। প্রস্তাবিত আকাশট্রেনের কায়দা অনেকটা প্লেনের মতই, কেননা বায়ুর চাপ এর গতির সহায়ক ক্যারাভেল প্লেনের ককপিটে যেমন থাকে সেই ধরণের একটি জেট থাকবে এই ট্রেনের মাথায়। রেলপথটি হবে উঁচু থামের উপর স্থাপিত কুড়ি সেন্টিমিটার চওড়া উঁচুতে থাকার জন্য নীচে চাষের কাজ বিনা বাধায় হতে পারবে। একবার চালু হলে এই নতুন ধরণের ট্রেন পৃথিবীর পরিবহন ব্যবস্থায় যে যুগান্তর আনবে সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

২. আজি হতে শতবর্ষ পরে

আজ থেকে একশো বছর পরে সাধারণ পরিস্থিতি কেমন হবে সেটা খানিকটা আন্দাজ করতে সকলেই পারেন। কোন একটি বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পে পড়া গেল চাঁদ থেকে গোপনে পৃথিবীর হীরে পাচার করার অভিযোগে মহাকাশচারী পাইলটের চাকরী গেছে। একশো বছরে আমূল বদলে যাবে মনুষ্যচরিত্র এমন জিনিস নয়। তবে ক্রমাগত মহাশূণ্যে চলাচলের ফলে মনুষ্যদেহে কিছু কিছু পরিবর্তন হয়ত ঘটতে পারে। বৈজ্ঞানিকরা এক শতাব্দী আগেই ভারশূণ্যতার সবরকম সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে দেখছেন এবং সেজন্য সব রকমে প্রস্তুত হচ্ছেন। আপনারা হয়ত এই সমস্যাটার গুরুত্ব বুঝতে

না পেরে ভাবছেন মহাকাশ বিজয়ে যে প্রধান দুটি বাধা ছিল— জ্বালানী আর নিস্ক্রমণ বেগ, সে দুটিই যখন পার হতে পারা গেছে তাহলে আর চিন্তার কি আছে। এবারে মানুষ অনায়াসে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে পাড়ি দেবে। কিন্তু অধৈর্য্য হবেন না। ভারশূণ্য অবস্থায় এক বছর থাকতে হলে স্বাস্থ্য কি করে ভালো রাখা যাবে সেটাই আসল চিন্তার বিষয়। কেননা মানুষ নামক যন্ত্রটির তো ইঞ্জিনিয়াররা ইচ্ছামত ডিজাইন বদল করতে পারেন না, এটাই হয়ে গেছে তাঁদের প্রধান হ্যাণ্ডিকাপ। বহুক্ষণ শূণ্য মহাকর্ষে থাকলে কি কি হতে পারে ? পৃথিবীতে যখন আমরা চলাফেরা করছি তখন কি হয় ? তখন মহাকর্ষ চাইছে শরীরের সমস্ত রক্ত টেনে পায়ের দিকে নামাতে। কিন্তু হৃদযন্ত্র আর রক্ত সংবহনতন্ত্র কেবলই তাকে বাধা দিচ্ছে। আমরা যখন হাঁটছি তখন পায়ের পেশীর সংকোচন ও প্রসারণের ফলে কেবল চেষ্টা চলছে শিরাগুলির মধ্যে ঠেলা মেরে রক্ত-প্রবাহকে হৃদপিণ্ডের দিকে চালিয়ে দেবার। মহাশূণ্যে এরকম কোন বাইরের শক্তির সঙ্গে বোঝাপড়ার প্রশ্ন নেই, কাজেই আমাদের রক্ত সংবহনতন্ত্রের পরিশ্রম অনেক কমে যায়। ঐভাবে কিছুদিন থাকার পর পৃথিবীতে ফিরলে মুস্কিলে পড়তে হবে, কেননা ততদিনে হৃদপিণ্ড তার রক্তের ধমনীগুলি হয়ে পড়েছে দুর্বল ও অকেজো। এই অবস্থার প্রতিকার করার জন্য কোন যান্ত্রিক উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে কিনা বৈজ্ঞানিকরা ভেবে দেখছেন, যাতে মহাশূণ্যে গিয়েও দেহের যন্ত্রপাতিগুলি একই ভাবে কাজ চালিয়ে যেতে পারে।

৩. মহাকাশের পাইলট

ইঞ্জিনিয়াররা ক্রমে বেকার হয়ে পড়ছেন, চাকরীর বাজার মন্দা, ভবিষ্যতে কি হয় কিছু বলা যাচ্ছে না তবে একটা কথা ঠিক যে সময় এবং প্রগতি কারো জন্য থেমে থাকবে না। মহাকাশ যুগে কয়েকটি দেশ ইতিমধ্যেই পদার্পণ করেছে, অন্যেরাও হয়ত ধীরে ধীরে তাদের অনুগামী হবে। ভবিষ্যতে যে ঘোষ, বোস, চাটুজ্যেদের ছেলেরাও মোটা মাইনে নিয়ে পৃথিবী থেকে চাঁদে পাইলটি করবেনা তার স্থিরতা কি।

মহাকাশচারী অবশ্য ইচ্ছে করলেই হওয়া যায় না, তার জন্য কঠিন ট্রেনিং আছে। প্রথমতঃ মহাকাশচারী আছে দুরকমের, বৈজ্ঞানিক ও পাইলট। উভয় শ্রেণীর লোককেই হতে হবে শ্রেষ্ঠ শারীরিক ও মানসিক পটুত্বের অধিকারী। আমেরিকাতে প্রথম যে সাতজনকে (মার্কারি এষ্ট্রোনট) মহাকাশ চারণের শিক্ষা দেওয়া হয় তাদের প্রত্যেকেরই ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি ছিল, ওজন ছিল একশো আশী পাউণ্ডের কম, উচ্চতা পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চির ভিতর এবং বয়স অনূর্ধ চল্লিশ।

মহাকাশযানের প্রত্যেকটি অংশ যে থাকতে হবে এদের নখদর্পণে সে কথা বলাই বাহুল্য। তাছাড়া কিভাবে যান ছোঁড়া হয়, কিভাবে কক্ষপথ বদলাতে হবে, কিভাবে বায়ুহীন চাঁদে কেবলমাত্র রকেট শক্তি দিয়ে নামতে হবে, কি করে পৃথিবীর বাতাবরণের মধ্যে পুনঃপ্রবেশের সময় যান নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, কিভাবে নির্দিষ্ট জায়গায় ফিরে আসতে হবে এবং প্যারাস্যুটের সাহায্যে নামতে হবে এসবই তাদের জানতে হয়।

এছাড়া ভূগোল ও ভূতত্ত্ববিদ্যার জ্ঞান অত্যাবশ্যক। চাঁদের ভূপ্রকৃতি সম্বন্ধে ফিরে এসে রিপোর্ট দিতে হবে, কাজেই কেবল প্রাকৃতিক শোভা নিরীক্ষণ করলে চলবে না, পাহাড় পর্বতের স্বভাব চরিত্র বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বুঝতে হবে। তারার সাহায্যে আকাশে গতিপথ ও দিক ঠিক করাও সেকালের নাবিকদের মত এদের অবশ্য পাঠ্য। বায়ুহীন কক্ষে স্পেস স্যুট পরে থাকা যেমন এদের অভ্যাস করতে হয়, তেমনি অভ্যাস করতে হয়, পৃথিবীর চেয়ে বহুগুণ বেশী মহাকর্ষের টানের মধ্যে থাকা। প্রচণ্ড শক্তিতে নানা দিকে ঘুরপাক খাইয়ে তার মধ্যে এরা মাথা ঠিক রেখে মহাকাশযান চালাতে পারবে কিনা তারও পরীক্ষা হয়। সব রকম চরম প্রাকৃতিক অবস্থা ও বিপদজনক পরিস্থিতিতে, যেমন মরুভূমি, জঙ্গল ও সমুদ্রে দীর্ঘদিন একা রেখে এদের সহ্যশক্তির সীমা বাড়ানো হয়।

৪. পুরাকালে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র

অটোমেশনের ফলে চাকরী যাবার আশঙ্কায় আমাদের দেশে যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ক্রমেই তিক্ত হয়ে উঠছে। এরকম কোন আশঙ্কা যেখানে নেই সেখানেও লোকে যন্ত্রপাতির নাম শুনলে তার দশ হাত দূর দিয়ে হাঁটেন। যন্ত্র মানেই কি জটিলতা? যন্ত্র মাত্রেরই কি কাজ এমন কিছু যার সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের কোনই কৌতূহল থাকতে পারে না? হতে পারে মহাকাশে নকল উপগ্রহ পাঠানোর ব্যাপারে আমাদের তত মাথাব্যথা নেই, কিন্তু নেহাত অদরকারী কাজে, এমন কি কেবলমাত্র মজা দেখবার বা অবসর বিনোদনের জন্যেও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ব্যবহার হয়েছে। শুধু আজ নয়, ভাবলে অবাক হতে হয় আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগেও।

খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে বিখ্যাত ঐতিহাসিক হেরোডোটাস মিশরে বেড়াতে গিয়ে এক আশ্চর্য জিনিস দেখেছিলেন। পুতুল নাচ দেখতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করলেন হাত দিয়ে সুতো টানার বদলে ব্যবহার হচ্ছে লুকোনো স্প্রিং ও লিভার। তার কয়েক শতাব্দী পরে মিশরেই একটি বারো ফুট উঁচু মূর্তি তৈরি হয়েছিল, তার ভিতরে এমন সব ব্যবস্থা ছিল যাতে ভোজসভায় অতিথিদের সে নিজে থেকে পানীয় ঢেলে আপ্যায়িত করতে পারত। বলা যেতে পারে এটিই পৃথিবীর প্রথম রোবট।

যিশুখৃষ্টের সমসাময়িক ছিলেন আলোক-জান্দ্রিয়ার হিরো। তিনি না ছুঁয়ে মন্দিরের দরজা খোলার এমন এক ব্যবস্থা করেছিলেন যা আজকের স্বয়ংচালিত দরজার সঙ্গে তুলনীয়। তবে আজকাল নিজে থেকে দরজা খোলার ব্যবস্থা হয় বৈদ্যুতিক উপায়ে। হিরোর আমলে পদ্ধতিটি ছিল বেশ অভিনব। মন্দিরের ভিতরে বেদীর তলায় রাখা হল একটি মুখবন্ধ জলের আধার, তার সঙ্গে দুটি টিউব লাগানো। একটি বেদীর সঙ্গে যুক্ত, অন্যটি একটি খালি বালতি পর্যন্ত প্রসারিত। মন্দিরের মধ্যে আগুন জ্বালালে ভিতরের হাওয়া গরম হয়ে আয়তনে বেড়ে ঐ টিউবের মধ্যে দিয়ে জলের আধারে ধাক্কা দিত, ফলে অন্য টিউব দিয়ে জল গিয়ে পড়ত ঐ বালতিতে; জলের

বালতির সঙ্গে দড়ি দিয়ে এমনভাবে বাঁধা ছিল দরজা যাতে বালতি ভারী হতে থাকলে দড়িতে টান পড়ে ও দরজা সেই টানে খুলে যায়।

একদিক দিয়ে হিরোর আবিষ্কৃত এই পদ্ধতিকে আধুনিক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের প্রপিতামহ বলা যায়। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের কাছে আমরা কি আশা করি? একটা সুইচ টিপে দিলে একের পর এক অনেকগুলি কাজ হতে হতে শেষ পর্যন্ত আমরা যা চাইছি তা পাওয়া যাবে। হিরোর ব্যবস্থাতেও তাই ছিল। এখানে আগুন জ্বালাটা সুইচের কাজ করেছে।

৫. চিন্তাশীল যন্ত্র

সেই সব আশ্চর্য মনিষীদের কথা ছোটবেলায় আপনি নিশ্চয় শুনেছেন (এখনও মাঝে মাঝে তাঁদের সাক্ষাত মেলে) যাঁরা মুখে মুখে একটি পাঁচ অংকের সংখ্যাকে আর একটি পাঁচ অংকের সংখ্যা দিয়ে গুণ তৎক্ষণাৎ তাকে একটি সাত অংকের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে ফেলতেন—একবারও খাতা পেন্সিলের সাহায্য না নিয়ে। আজকাল যদিও টাকা আনা পাইয়ের ঝামেলা মিটে গেছে তবু এরকম মস্তিষ্কের অধিকারী হতে পারলে কে না সুখী হত। কমপিউটার হল অনেকটা এই রকম একটি অসাধারণ যন্ত্রমস্তিষ্ক যার একমাত্র কাজ. তাড়াতাড়ি এবং নির্ভুলভাবে শক্ত শক্ত সমস্যার উত্তর বার করে দেওয়া। কম্পিউটার শুধু যে হিসেব করে তাই নয় একে অনুবাদ করানো, গান লেখানো ইত্যাদি অন্য ধরণের কাজ দিয়েও দেখা গেছে তাতেও ইনি কিছু কম যান না।

যেভাবে আমাদের মগজ কাজ করে কমপিউটার কি সেইভাবে কাজ করে? যন্ত্রের মাথায় বুদ্ধি কোথা থেকে এল? শেষে কি মানুষের চিন্তাশক্তিকেও ছাড়িয়ে যাবে। এই যান্ত্রিক মগজ? ভাবতে গেলে আমাদের আত্মসম্মানে একটু সূক্ষ্ম আঘাত লাগবে বৈ কি? তবে কমপিউটার বেচারা একে চলৎশক্তিহীন তার ওপর সোজা বাংলা (বা ইংরিজী) বুঝতে অক্ষম, কাজেই তার প্রতি আমাদের ঈর্ষান্বিত হবার কিছু নেই। কমপিউটারের কাজ অংক কষা একথা ঠিক কিন্তু

সে অংক তাকে যে কেউ যেমন তেমন ভাবে করতে বললে তাকে দিয়ে একফোঁটাও কাজ পাওয়া যাবে না। এর জন্য কমপিউটারের বিশিষ্ট ভাষা বা কোড শিখতে হবে। যে সব খবর কমপিউটারের মগজে ভর্তি করার কথা সেগুলি সব ঐ কোডে রূপান্তর করে তবে পুরতে হবে।

কথায় বলে হাতির স্মৃতি বড় মারাত্মক। কমপিউটারের স্বভাবও অনেকটা হাতির মত। তার মাথায় একবার যা ঢোকানো হয় তা সেখানেই সযত্নে রক্ষিত থাকে। একে বলা হয় মেমারি। মনে রাখতে হবে কমপিউটার যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়, সুতরাং তার মেমারিকে আগে থেকে যেসব তথ্য দিয়ে ভর্তি করা হয়েছে তার বাইরের প্রশ্ন জিগেস করলে সদুত্তর পাবার আশা নেই বরং শর্ট সার্কিট হবার সম্ভাবনা।

কমপিউটারকে পছন্দ করা বা না করা আমাদের ইচ্ছে কিন্তু তার দ্বারা ইতিহাসের গতি আটকাতে পারা যাবে বলে মনে হয় না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে এর প্রচলন আরম্ভ, ক্রমে এটি বিজ্ঞান ও শিল্পে প্রায় অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, এমনকি কলকাতাতেও বেশ কিছুদিন হল কয়েক জায়গায় এর আগমন ঘটে গেছে।

৬. চাই মুক্ত বায়ু

কিছুদিন আগে বারাউনি তৈল শোধনাগার থেকে মুঙ্গেরের গঙ্গার জলে আগুন লাগা ও জল দূষিত হওয়ার কথা সকলেই শুনেছেন। যথেষ্ট সাবধান না হলে এরকম দুর্ঘটনা ভবিষ্যতে আর না ঘটাই উচিত কিন্তু এর থেকে আমরা আবার নতুন করে সভ্যতার এক অভিশাপ সম্বন্ধে সচেতন হলাম, তা হল ক্রমাগত কল-কারখানার বিস্তার হতে থাকলে বাতাস (ও স্থান বিশেষে জলের) কলুষিত হওয়া।

যে কোনো লোক দিনে প্রায় দেড় কিলো খাদ্য দু কিলো পানীয় এবং দশ কিলো বাতাস গ্রহণ করে থাকেন। নির্জলা উপবাসে কেউ হয়তো কিছু দিন কাটাতে পারেন, কিন্তু বাতাস তাঁকে ঐ দৈনিক দশ কিলো পরিমাণ গ্রহণ করতে হবেই, বিধাতার এমনই আশ্চর্য নিয়ম। বাতাসের জগতে বাস করছি বলে আমরা যা করতে যাই তাতেই

বাতাস এসে বাধ সাধে। বাতাস না থাকলে কে আর তেজস্ক্রিয় ভস্ম নিয়ে মাথা ঘামাত। হিমালয়ের ওপরে যে যত ইচ্ছে অ্যাটম বোমা ফাটাক তাতে আমাদের কি। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাতাসের দেশ বিদেশ নেই। কারা পৃথিবীতে এতদিন যত পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটেছে তার ফলে শোনা যাচ্ছে ইতিমধ্যেই পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের তত্ত্বেও নিয়মে যদিও বা দুচারজন ভাগ্যবান ব্যক্তি অক্ষত অবস্থায় থাকেন তাহলে আরো আশংকার কথা। তাঁদের ভাগের সেই দুদিন এসে আশেপাশের অন্য কারো আয়ু থেকে বিযুক্ত হবে।

যে সব রাসায়নিক মৌলের যে রকম আনুপাতিক সমাহারে হাওয়া তৈরি হওয়ার কথা সেরকম হাওয়া কিন্তু পৃথিবীতে আর বড় একটা দেখা যাচ্ছে না, নেহাত মাঝ সমুদ্র বা উঁচু পাহাড়ে ছাড়া। এখন হাওয়ার মধ্যে নানা বিজাতীয় পদার্থ এসে পড়ছে, যত সভ্যতা এগোচ্ছে তত হাওয়ার দূষিত ভাব আরো বাড়ছে, যদিও আমাদের দেশে সভ্যতার এই অভিশাপ ততটা প্রবলভাবে অনুভূত হয়নি কিন্তু শিল্পাঞ্চলে, যেখানে ধোঁয়া বেশী সেখানেও অগণিত নরনারী এই কলুষিত বাতাস দিনের পর দিন গ্রহণ করছেন। ১৯৫২ সালের ডিসেম্বরে লণ্ডন সহরে যে চারদিন ব্যাপী ভয়ানক কুয়াশা হয়েছিল তার ফলে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়। প্রতিদিন বাড়ী ও কল-কারখানাগুলির চিমনী থেকে সত্তর হাজার টন কয়লার ধোঁয়া বাইরে বেরোতে থাকে ও কুয়াশার মধ্যে আটকে গিয়ে পথ চলা বিপদজনক করে তোলে। তিন দিনে কুয়াশার রং ক্রমে ধূসর থেকে কালচে শেষে মিশমিশে কালো হয়ে যায়। দেখতে না পেয়ে ডক থেকে সমুদ্রে পড়ে, দিক ভুল করে দম বন্ধ হয়ে বহু লোকে মারা যান। তাছাড়া যাঁদের হাঁপানি বা কোন হৃদয়রোগ আছে তাঁরা ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েন। বহু লোকের মৃত্যু হয়। দূষিত বাতাসের জন্য এরকম সার্বজনীন মৃত্যুর ঘটনা অবশ্য কমই আছে কিন্তু দিনের পর দিন অস্বাস্থ্যকর বাতাস শরীরে গ্রহণ করা যে কোনো কাজের কথা এ সম্বন্ধে কোন দ্বিমত থাকতেই পারে না।

৭. কার আয়ু কতদিন

মানুষ বাঁচে কিসে ? টলষ্টয় বলেছিলেন প্রেমে। কথাটা কি বিশ্বাসযোগ্য ? অন্তত উজবেকিস্থানের দীর্ঘজীবি বৃদ্ধেরা সে কথায় সায় দেবেন না। তাঁরা বলেছেন মুক্ত হাওয়া, ভাবনা চিন্তা করা আর লম্বা পদচারণা এই করে তাঁরা একশো বছর সুস্থদেহে কাটিয়ে দিচ্ছেন। ধূমপান না করাটা কেউ কেউ কারণ বলে উল্লেখ করলেও অনেকে ধূমপান করেও হেসে খেলে দেড়শোয় পা দিয়েছেন দেখা যাচ্ছে। এ সম্বন্ধে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থারও কিছু বক্তব্য আছে। অনুন্নত, উন্নয়নশীল এবং উন্নত দেশগুলিকে যদি চারটি ভাগে ভাগ করা যায় এবং সুবিধার জন্য তাদের ক, খ, গ, ঘ বলে উল্লেখ করা যায় তাহলে পাশের চার্টে দেখা যাবে এদের জনসংখ্যার গড় আয়ুষ্কাল কোন সালে কতটা। বলা বাহুল্য এটি তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান মাত্র, এবং 'ঘ' শীর্ষক দেশে ২০০০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুর সম্ভাবনাকে আরো দূরে টেনে নিতে হলে কেবল চিকিৎসাবিজ্ঞানের বাহাদুরী দেখালেই চলবে না। আরও অনেক প্রচেষ্টা এর মধ্যে জড়িত, দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস করা তার মধ্যে প্রধান।

মানুষ নামক যন্ত্রটি কতদিন টিকটিক করে চলতে পারে ? একশো বছর ধরে নিলে হিসাবের বেশ সুবিধা হয়। আমাদের শাস্ত্রে আছে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ, সন্ন্যাস এই চার আশ্রমের কথা। প্রত্যেকটি আশ্রম পঁচিশ বছর ধরে নিলে পঞ্চাশে বাণপ্রস্থ, পঁচাত্তরে সন্ন্যাস। বাইবেলে আছে মানুষের জীবনের স্থায়িত্ব তিন কুড়ি দশ। অর্থাৎ সত্তর। তবে একথা ঠিক যে বিজ্ঞানের দৌলতে আধিব্যাধির প্রকোপ প্রায় নেই, শিশুমৃত্যুর হার কমেছে। জন্ম মুহূর্তে যে কোন শিশুর দীর্ঘজীবন লাভের সম্ভাবনা বিশ বছর আগে যা ছিল আজ তার চেয়ে উজ্জ্বলতর। পৃথিবীর উন্নততম দেশগুলিতে পুরুষদের আয়ুষ্কাল সত্তর পঁচাত্তর এবং নারীদের আশী বছর বলে ধরা হচ্ছে।

৮. অমরত্বের খোঁজে

শেষ অবধি মানুষের উদ্দেশ্য কি? মৃত্যুকে জয় করে অমরত্ব লাভ? অতদূর না গেলেও নোবেল পুরস্কার জয়ী জীববিজ্ঞানী মূলার এর মত অনেকে অতিমানব সৃষ্টির পক্ষপাতী। যখন কৃত্রিম হৃদযন্ত্র কিডনী ইত্যাদির প্রচুর পরিমানে উৎপাদন হতে থাকবে, হর্মোন, এনজাইম, অ্যানটিবডি ইত্যাদি করা যাবে ইচ্ছামত সংযোজন ও সংশ্লেষণ সেই দিন প্রায় সমাগত। এখনই হৃদবদলের ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠছে ন্যায় ও ধর্মের দিক থেকে। কাজেই কিছুই আর অসম্ভব থাকবে বলে মনে হয় না। অতিমানব তৈরীর সম্ভাবনাকেও হেসে উড়িয়ে দেওয়া যুক্তযুক্ত নয়, বরং এর দ্বারা সামাজিক ও নৈতিক যেসব সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে সেদিকে চিন্তা করাই বাঞ্ছনীয়। শুধুমাত্র হৃদবদলই যে বিরাট সম্ভাবনার দিগন্ত খুলে দিচ্ছে—পরমাণু শক্তির আবিষ্কার তার কাছে কিছুই নয়।

মানুষ কি পঁচাত্তরের বদলে পঁচাশী বছর পর্যন্ত বেঁচেই পরিতৃপ্ত হবে? অথর্ব হয়ে বেশীদিন বেঁচে থাকার মত ভয়াবহ আর কি আছে? অথচ চিকিৎসাবিজ্ঞানের কল্যাণে অবস্থাটা প্রায় সেই দিকেই চলেছে মনে হয়। মারা যাবার কারণগুলি দূরীভূত হচ্ছে, কাজেই জীবন হচ্ছে দীর্ঘতর। বিশেষজ্ঞরা যে এই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না তা নয়। যদি মানব শরীরের কলকৌশলে গুরুত্বপূর্ণ রদবল করা মানুষের পক্ষেই সম্ভব হয় তবে জীবন দীর্ঘতর করার চেয়ে যৌবন দীর্ঘতর করার প্রচেষ্টা কি অধিকতর কাম্য হবে না? দেবী অরোরা স্বর্গরাজ জিউসের কাছ থেকে টিথোনাস নামক মরণশীল মানব সন্তানের জীবনভিক্ষা করেছিলেন। টিথোনাস অমর হয়ে বেঁচে রইল বটে কিন্তু অরোরা আসল কথাটাই ভুলে গিয়েছিলেন। বার্দ্ধক্য যে মানুষের নিত্য সহচর একথা তাঁর মনে থাকলে হয়ত তিনি টিথোনাসের অমরত্ব প্রার্থনা করতেন না। টিথোনাস বেঁচে রইল বটে, কিন্তু জরার প্রকোপে জীবন্মৃত হয়ে। আধুনিক বিজ্ঞান কি মানুষকে এই অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে পারবে?

৯. শক্তির নতুন উৎস—পরমাণু

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে উদ্দালক ঋষির কথা। উদ্দালক ঋষির ছেলের নাম শ্বেতকেতু। একদিন গাছের তলায় বসে ছিলেন উদ্দালক, ছেলেকে ডেকে বললেন যাও একটা বটফল কুড়িয়ে আনো। আনল শ্বেতকেতু।

ভাঙো তো দেখি। বললেন উদ্দালক।

দু-টুকরো হল বটফল।

আবার ভাঙো।

আরেক টুকরো হল।

কি আছে ভিতরে ?

ছোট ছোট বীজ।

এবার একটা বীজকে আধখানা কর।

করা হল।

তাকেও আধখানা কর।

করা যাচ্ছে না।

উদ্দালক তখন ছেলেকে বোঝালেন, দৃষ্টির অগোচর বটের বীজের ঐ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশের মধ্যেই আছে বটের প্রাণশক্তি। কতটুকু সেই পরম ক্ষুদ্রাংশ আর কি বৃহৎ এই বট।

বস্তু ভাঙছে, তারপর আবার নতুন করে তৈরি হচ্ছে, এটা হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির একটা মূল কথা। এ নিয়ে বহুকাল ধরে লোকে চিন্তা করে এসেছে। অনেকদিন ধরে চিন্তা ভাবনা ও পরীক্ষার পর বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন যে যা আর ভাঙা যায় না এমন সব বস্তুকণার সমবায়ে বিশ্বজগতের সব কিছু তৈরি। সেই কণাই হল মৌলিকতম। বস্তুর একেবারে আদিতে আছে যে অবিভাজ্য কণিকা তারই নাম পরমাণু বা ইংরিজীতে অ্যাটম। এই দুটি নামই এখন লোকের মুখে মুখে ফিরছে।

খ্রীস্টজন্মের আগে গ্রীস দেশের পণ্ডিতরাও এ বিষয়ে চিন্তা করেছিলেন। কোন বস্তুকে যদি ক্রমাগত ভাঙা যায় তবে ভাঙতে

ভাঙতে তা এমন অবস্থায় এসে পৌঁছবে যার পর তাকে আর ভাঙা যাবে না। সেই অবিভাজ্য কণার নাম তাঁরা দিলেন অ্যাটম। অ্যাটম কথাটারই অর্থ হল যা আর ভাঙ্গা যায় না। বাংলায় পরমাণু শব্দের অবশ্য সেরকম কোন অর্থ নেই। পরমাণুর অর্থ পরম ক্ষুদ্রাংশ।

কিন্তু গত শতাব্দীতে কয়েকটা আবিষ্কারের পর দেখা গেল গ্রাক পণ্ডিতরা পরমাণুর নামকরণে একটা বিরাট ভুল করে ফেলেছিলেন। যা আর ভাঙা যায় না তাই অ্যাটম, কিন্তু যদি দেখা যায় অ্যাটমও ভাঙ্গা যাচ্ছে, অ্যাটম মোটেই পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা নয় তখন কি করা হবে ?

পরমাণুর ভিতরে ক্রমে আরো ছোট কণার সন্ধান পাওয়া গেল। জানা গেল পরমাণুর মধ্যে আছে একটি নিউক্লিয়াস ও তাকে ঘিরে ছুটন্ত ইলেকট্রনের ঝাঁক। বিখ্যাত বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিনকে (১৮২৪-১৯০৭) যখন খবর দেওয়া হল পরমাণু আর সেই সেকেলে গ্রীক অর্থে আ-ভাঙা অ্যাটমটি নেই তখন তিনি অবিশ্বাসের হাসি হেসে বলেছিলেন তা কি কখনো সম্ভব ? অ্যাটম মানেই হল যাকে আর ভাঙা যায় না। শুনে নাকি সংবাদদাতা মুচকি হেসে মন্তব্য করেছিলেন, বেশী গ্রীক জানার ঐ হচ্ছে বিপদ।

বিশ্বাস কেউ করুক অথবা না করুক পরমাণু বিজ্ঞানে নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার হয়েই চলল। ১৯৩৯ সালে ইংলণ্ডের এক বিজ্ঞান পত্রিকায় ছোট্ট করে একটি খবর ছাপা হল। খবরটা ছিল এই যে জার্মানীতে ফ্রিশ ও মাইটনার নামে দুজন বিজ্ঞানী পরমাণু বিভাজন করে এক নতুন ধরনের শক্তির সন্ধান পেয়েছেন। এই খবরটা যে ভবিষ্যতে কি বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করবে সেটা বুঝতে পারলে সম্পাদক মশাই যে বড় বড় শিরোনামায় এই আশ্চর্য আবিষ্কারের কথা ছাপতেন তাতে সন্দেহ নেই।

বিভাজন হল বিজ্ঞানের এক যুগান্তকারী আবিষ্কার। এর আগে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছিলেন বস্তুর শক্তিতে রূপান্তরের কথা। বিভাজন এই তথ্যকে একেবারে হাতেনাতে প্রমাণ করে দেখিয়ে দিল। একটি ইউরেনিয়ম পরমাণুর নিউক্লিয়সে নিউট্রন কণিকা দিয়ে

আঘাত করলে সেটি প্রায় সমান ছুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়—সংক্ষেপে এই হল বিভাজনের ঘটনা। কিন্তু এর মধ্যে যাকে যুগান্তকারী বলা হচ্ছে সেটা হল এই বিভাজনের ফলে পাওয়া একটি বিশেষ ব্যাপার। টুকরো ছুটির ওজন যোগ করলে দেখা যাচ্ছে তা মূল নিউক্লিয়সের ওজন থেকে কম। বিজ্ঞানের পরিভাষায় তাই বিভাজন মানেই খানিকটা বস্তু অবলুপ্ত হয়ে যাওয়া।

আসলে বস্তু কিন্তু একেবারে অবলুপ্ত হচ্ছে না। হারিয়ে যাওয়া বস্তুর চেহারা বদলে পরিণত হচ্ছে শক্তিতে। বিভাজনের বিষয় হল এই যে একটি ইউরেনিয়ম পরমাণুর কেন্দ্রে বিভাজন ঘটিয়ে বার হচ্ছে ছুশো মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি। একেই বলা হয় পরমাণু শক্তি। এই শক্তির হঠাৎ বিস্ফোরণ হলেই হল পরমাণু বোমা—আর নিয়ন্ত্রণ করে গ্রীডে চালান দিলেই পাওয়া যাচ্ছে ঘরে ঘরে আলো জ্বালাবার, পাখা চালাবার বিদ্যুৎ। বোমা আর জ্বালানীর মধ্যে এই হল তফাত—জ্বালানিতে শক্তি নির্গমনের হার কম আর বোমা মানে একসঙ্গে সমস্ত শক্তিটা বার হওয়া।

বস্তু অবলুপ্ত হওয়া বলতে কি কি বোঝায়? অবলুপ্ত মানে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হওয়া পোড়ানো নয়। এক টুকরো কয়লা পোড়ালে বস্তুর চেহারা বদলাচ্ছে, কয়লা পরিণত হচ্ছে ছাই-এ, কিন্তু বিনাশ পাচ্ছে না। জ্বালানি হিসেবে আমরা যখন কয়লা পোড়াই তখন তা থেকে শক্তি পাওয়া যায় ঠিকই। সেটা কতখানি শক্তি? একগ্রাম ভাল কয়লা যদি শুদ্ধ অক্সিজেন গ্যাসে পোড়ান হয় তবে তা থেকে যা শক্তি পাওয়া যাবে তা দিয়ে বড় জোর তিন কাপের মত চায়ের জল গরম করা যায়। মনে রাখতে হবে এটা রাসায়নিক শক্তি—কারণ পোড়ান কয়লা বিনষ্ট হয় না, অন্য রাসায়নিক যৌগিক পদার্থে পরিণত হয়। যদি কোন দিন কয়লার মধ্যে বস্তুকে সত্যি সত্যি নিশ্চিহ্ন করে নিয়ন্ত্রিত হারে শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয় তবে একগ্রাম বস্তু দিয়ে কলকাতা শহরকে বর্তমান হারে কুড়ি বছর ধরে অনায়াসে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করা যেতে পারে। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে পরমাণু শক্তির গুরুত্ব কতখানি!

বিশেষ করে আমাদের দেশে পরমাণু থেকে নিয়ন্ত্রিত হারে শক্তি বার করার তোড়জোড় শুরু হয়েছে অনেকদিন থেকে। একেবারে স্বাধীনতার ঠিক পর থেকেই। এর কারণ আমাদের দেশে অন্য জ্বালানীর অভাব অথচ পারমাণবিক জ্বালানীর সঞ্চয় যথেষ্ট আছে সাধারণতঃ শক্তি পাওয়া যায় কয়লা, পেট্রোল ও গ্যাস এই কটি জ্বালানী থেকে। তবে এ ছাড়া জলস্রোত থেকেও বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়। তবে কয়লা এবং পেট্রোলিয়ম ব্যবহারের ফলে ক্রমশঃ ফুরিয়ে আসছে। হিসেব করে দেখা গেছে আমাদের দেশে জানা কয়লার সঞ্চয় তা আমাদের প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। বিশেষজ্ঞরা হিসেব করে দেখেছেন যে ২০০০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ যদি ভারতের জন-সংখ্যা ৬০ কোটিতে আটকে থাকে তাহলে আমাদের কয়লা, পেট্রো-লিয়ম প্রভৃতি ফুরিয়ে যেতে বেশি দিন লাগবে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে চাইলেও আমাদের পক্ষে বেশি শক্তি খরচের উপায় নেই। কারণ বিদ্যুৎ তৈরি হবে যা থেকে সেই কাঁচা মালেরই টানাটানি। তাছাড়া দ্রুত শিল্পোন্নয়ন করে অন্য উন্নত দেশের সঙ্গে সমান হবার চেষ্টা করতে গেলেও আমাদের শক্তির দরকার হচ্ছে। সুতরাং এমন কোন জ্বালানী চাই যা আমাদের অনেকদিন ধরে প্রচুর পরিমাণে শক্তি যোগাবে।

কয়লা ব্যবহারের অসুবিধেও কিছু কম নয়। এর মধ্যে প্রধান হল কয়লা স্থানান্তর করা। ভারতের সব কয়লা খানিগুলি পূর্ব ও মধ্য ভারতে। সেখান থেকে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে লক্ষ লক্ষ টন কয়লা নিয়ে যাওয়াই একটা সমস্যা। পারমাণবিক জ্বালানি ব্যবহারের সুবিধে এই যে একই আয়তনের জ্বালানি কয়লার থেকে কোটিগুণ বেশি শক্তি দেবে। সুতরাং এর স্থানান্তরের সমস্যা বিশেষ নেই।

তবে পরমাণু থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন বলা যত সহজ কাজে ততটা নয়। সাধারণ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সঙ্গে এর এইখানেই তফাত। যে যন্ত্রে নিয়ন্ত্রিত হারে শক্তি বার করা তাকে বলে রিঅ্যাকটর। যতক্ষণ পর্যন্ত পারমাণবিক বিজ্ঞান ও কলাকৌশলকে আয়ত্তে আনা না হচ্ছে ততক্ষণ এরকম কোন শক্তিকেন্দ্রে হাত দেওয়ার প্রশ্নই উঠতে

পারে না। তাই স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে এমন পরিকল্পনা করা হল যাতে দেশের বিভিন্ন জায়গায় পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র চালু হতে দেশে পরমাণু বিজ্ঞানের ভিত্তি বেশ শক্ত গাঁথুনির উপর তৈরি হয়ে যায়। গবেষণা ও শিল্পের জন্য প্রথম কাজ আরম্ভ হল ট্রম্বেতে। তবে বিশুদ্ধ গবেষণা তার আগেই কলকাতার সাহা ইনস্টিটিউটে আরম্ভ হয়ে গেছে।

১৯৪৮ সালে যখন সাহা ইনস্টিটিউট এর ভিত্তি স্থাপিত হল তখন সেই উপলক্ষে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে যে সব নতুন ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটছে পরমাণু শক্তি তার মধ্যে একটি। আমরা অবশ্যই এ অবস্থায় নীরব ও নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে পারি না।'

আজ তারাপুর শক্তিকেন্দ্র গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। রাণাপ্রতাপ সাগর ও কলপক্কমে তৈরি হচ্ছে আরো দুটি শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র। এছাড়া বম্বে, কলকাতা, আমেদাবাদে পরমাণু গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং দেশের প্রায় পঞ্চাশটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরমাণু বিজ্ঞানে শিক্ষাদান চলছে। পরমাণু শক্তিই হল আমাদের ভবিষ্যতের আশা ভরসা।

১০. শেষের সেদিন ভয়ংকর

আর মাত্র তিরিশ বছর, কিম্বা খুব ঠিক করে বলতে গেলে বত্রিশ। ২০০০ খৃষ্টাব্দে সেই আশংকাজনক ঘটনা ঘটবে বলে বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেছেন। আপনি যদি মনে করে থাকেন ঘটনাটি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ, যখন পারমাণবিক বোমায় আমরা একেবারে ধ্বংস পাব তবে ভুল। এই আশংকার সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্কই নেই। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই ভয়াবহ পরিণতি সম্বন্ধে সাবধান হতে প্রায়ই আমাদের বলা হচ্ছে কিন্তু আমরা সে দিকে কান না দিয়ে ইলেকশন ইত্যাদি অকিঞ্চিৎকর ব্যাপারে মত্ত। অথচ আমরা সকলেই জানি পৃথিবীতে জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে খাদ্য উৎপাদন আর তাল রেখে চলতে পারছেনা। অতি আশাবাদী লোকেরাও ভাল করে জানেন

জনবহুল এবং বৃহৎ দেশগুলির লোকসংখ্যা কমিয়ে আয়ত্তের মধ্যে আনা দেবতারও অসাধ্য। সুতরাং ২০০০ খৃষ্টাব্দে যখন সমস্ত দূরপ্রাচ্য (তার মধ্যে আমরা পড়ি না) ভয়ানক খাদ্যাভাব আর দুর্ভিক্ষের কবলে পড়বে তখন আশ্চর্য হবার কিছুই থাকবেনা, আত্মতুষ্টিরও না, কেননা বিশেষজ্ঞরাই ঘোষণা করেছেন বাকি পৃথিবীর ঐ অবস্থা হতে লাগবে আরও তিরিশ বছর, অর্থাৎ ২০৩০ খ্রীস্টাব্দ। ইউনেসকো থেকে প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় এই ভয়ানক সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মাত্র তিরিশ বা যাট বছর যখন সমস্ত পৃথিবীবাসীর পরমায়ু তখন আর অনর্থক আলোচনা করে সময় নষ্ট করে কি হবে এরকম একটা ভাব মনে আসা স্বাভাবিক। কিন্তু আলোচনাটিতে কিঞ্চিৎ আশার আলোও আছে।

ইউনেসকোর কৃষি ও খাদ্য বিশারদরা বলেছেন কৃষিযোগ্য যা জমি সব দেশে আছে তার কিছু কিছু সর্বোচ্চ ফলন এখনই দিচ্ছে যেমন জাপান বা ইংলণ্ড। তাদের বিশেষ কিছু করণীয় নেই। ভারতবর্ষের মত দেশে এখনও ফলন বাড়াবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এতেও খাদ্য সংকট কাটছে না। সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের তাকাতে হবে সেই সব অঞ্চলের দিকে যা এতদিন কর্ষণযোগ্য ভূমি বলে গণ্য করা হত না। যেমন পাহাড়ী জমি, মরুভূমি, বনজঙ্গল, সাভানা, তুন্দ্রা ও দক্ষিণ মেরু। অবশ্য শেষ দুটি অঞ্চল নেহাতই অপারগ হলে। কিভাবে এখন এই সব অনিচ্ছুক অঞ্চল থেকে সোনা ফলানো যায় সেটাই বিবেচ্য।

১১. ত্রিমাত্রিক বনরোপণ

বৃক্ষরোপন ব্যাপারটা এমন কিছু নতুন নয়, প্রাচীন কালের প্রজারঞ্জন রাজারাও ছায়ার জন্য পথের দুই পাশে গাছ লাগাতেন। কিন্তু খাদ্য সমস্যা মেটাবার জন্য বনভূমিকে একই সঙ্গে তিনভাবে ব্যবহার করার এই পদ্ধতি একেবারেই আধুনিক। বনের সাধারণ উপকারিতা হল ভূমিক্ষয় নিবারণ এবং খানিকটা আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ। জ্বালানী ও অন্যান্য কাজের জন্য বন থেকে পাওয়া যায় কাঠ, বনভূমিতে

পালিত পশু থেকে মানুষ পাবে মাংস, ডিম, দুধ, ঘি প্রভৃতি। একই বন থেকে এই তিনটি সুবিধা যাতে পাওয়া যায় সেই দিকে এখন চেষ্টা চলেছে। মনে করা হচ্ছে ভালভাবে করা যেতে পারলে এর দ্বারা খাদ্য সমস্যার অনেকটা সমাধান হতে পারে। পৃথিবীর প্রধান সংকট হল কর্ষণযোগ্য ভূমির অভাব, কাজেই বনভূমিকে উপযোগী করে তুলতে পারলে অনেক সুবিধা। এখানে গাছ জন্মাবে অপেক্ষাকৃত নিরেস জমিতে এবং একবার লাগান হয়ে গেলে আর বেশী কিছু পরিশ্রম করতে হবে না।

১২. জাপানী পরীক্ষা

বৃক্ষরোপণ বন সংরক্ষণ ও পশুচারণের এই সংযুক্ত পদ্ধতি নিয়ে প্রথমে চেষ্টা করে দেখা হয় জাপানে, গত যুদ্ধের আগে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই অভিনব পদ্ধতি নিয়ে মোটেই হৈ চৈ হয়নি, অন্যান্য দেশে এই পরীক্ষার খবর পর্যন্ত পৌঁছয়নি। তারপরেই জাপান যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল এবং এই কৃষিপদ্ধতি একেবারেই ধামা চাপা পড়ে গেল। ১৯৪৬ সালের পর আবার যখন সৃজনশীল কাজের দিকে লোকেদের মনোযোগ ফিরে এল তখন বনভূমিকে মানুষের ত্রিমাত্রিক উপকারে লাগাবার চেষ্টা শুরু হল আর একবার। জাপানের যে সব উঁচু পাহাড়ে জঙ্গল কেটে প্রায় সাফ করে ফেলা হয়েছিল আসবাব পত্র, জ্বালানী আর জাহাজ তৈরীর জন্য সেখানে তখন পাহাড়ের গা উন্মুক্ত, ক্রমাগত ভূমিক্ষয় হতে আরম্ভ হয়েছে। অবিলম্বে বৃক্ষরোপন না করা হলে ভয়ানক ক্ষতি। গাছ লাগাবার সময় উপরিলাভ হিসাবে এমন সব গাছ লাগানো হল যাতে তাড়াতাড়ি ফল ফলে। বাদাম জাতীয় এমন সব গাছ পরীক্ষা-মূলক ভাবে লাগান হল যা থেকে পশুদের খাদ্যও পাওয়া যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে আশাতীত লাভ হয়েছে।

পরে দক্ষিণ আফ্রিকার সাভানা অঞ্চলও অনুরূপ অরণ্য রোপনের আওতায় আনা হয়েছে। এই নতুন খাদ্য উৎপাদন পদ্ধতির ফলে গ্রাম ও অরণ্য অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবিকা সংস্থান হবে, সেটাও একটা বাড়তি লাভ।